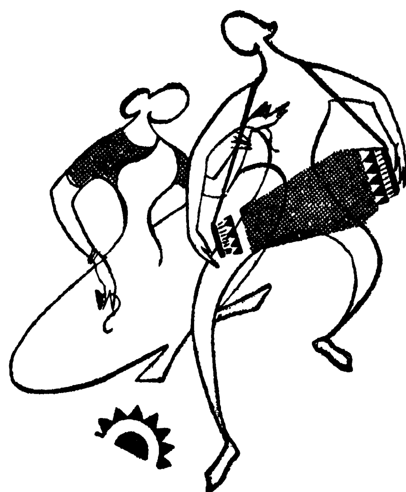


ষষ্ঠ ঋতু

সমরেশ বসু

নিও-লিট পাবলিশার্স
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ,
২০শে আষাঢ়, ১৩৬৩।

প্রকাশক :
প্রফুল্ল দাস
নিও-লিট পাবলিশার্স
২১৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :
কার্তিকচন্দ্র পাল
যোগমায়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১নং রাজেন্দ্র দেব রোড,
কলিকাতা—৭

প্রচ্ছদশিল্পী :
সুবোধ দাশগুপ্ত

ব্লকনির্মাণ : ব্লকম্যান

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ফটোটাইপ সিণ্ডিকেট

দুই টাকা

দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধনঞ্জয় দাশ

বিমল ভৌমিক

যুগান্তর চক্রবর্তী

প্রিয়বরেষু—

সংকলনের গল্পগুলির মধ্যে 'কটিচার' ব'লে একটি গল্প আছে। মাসিক পরিচয়ে গল্পটি প্রকাশ হওয়ার পর গল্পের নাম নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, মানে কি? মানে হচ্ছে বাক্যবাগীশ। অকারণ যে বাজে কথা বলে। নিতান্তই শিল্পাঞ্চলের একটি কথা। কোনও প্রাদেশিক ব্যাকরণে এর মানে পাওয়া যাবেনা।

সমরেশ বসু

ষষ্ঠ ঋতু
সোনাটির বাবু
শুভবিবাহ
ফটিচার
নিমাইয়ের দেশত্যাগ
সুচাঁদের বারোমাস্যা
উত্তাপ
ন' নম্বর গলি

ষষ্ঠ ঋতু

মেয়েমানুষটি দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে।

সামনের রাস্তাটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। সরু রাস্তা, দুপাশে ঘিঞ্জি বাড়ি। রাস্তার ধারে পানবিড়ির দোকানপাট। দক্ষিণে জেলেপাড়া, উত্তরে মালীপাড়া। মালীপাড়ায় মালী আর নেই। এখন নামটি বেঁচে আছে। ভাল কথায় লোকে বলে খারাপ পাড়া। মফঃস্বলের ছোট শহর হলেও, বেচা কেনা, হাট বাজার—বেশ জমজমাট শহর।

মেয়েমানুষটি যে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল, ওইখান থেকে মালীপাড়ার সুরু বলা যায়।

পৌষের দুপুর। দেখতে দেখতে রোদ কাত হয়ে গেছে কখন। পাড়াটার পূবের বাড়ীর চালাগুলি পেরিয়ে কোঠাবাড়ির মাথায় ঠেকেছে রোদ।

মেয়েমানুষটির দরজার মাথায় একটি ছোট সাইনবোর্ড টাঙ্গানো রয়েছে। লেখা আছে, 'শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দাসী, কীর্তন গায়িকা। ভিতরে অনুসন্ধান করুন।'

দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণভামিনী নিজেই। মাজা মাজা রং, দোহারা গড়ন। মধ্য-ঋতু আশ্বিনের নিস্তরঙ্গ ঢলো ঢলো শরীর। বয়সটা অবশ্য গিয়ে ঠেকেছে তলে তলে আর একটু দূরে। দিনের হিসেবে আশ্বিনের দিন কাবার হয়ে অগ্রহায়ণের একটু শীত ধরেছে সেখানে। একটু রাশভারি, দলমলে কৃষ্ণভামিনী। কপালের সামনে, পাতা পেড়ে চুল এগিয়ে দিয়েছে। সিঁথির সিঁদুর সামান্য। ডাগর চোখে এখনো সজাগ চাহনি, খরতাও আছে। কালো শাড়ী পরনে, গায়ে জামা নেই।

মুখে পান টিপে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে দক্ষিণে। চোখে ঠোঁটে রাগ রাগ ভাব। নাকছাবিটিও নড়েচড়ে উঠছে নাকের পাটায়।

পূব কোলের কোঠাবাড়ির বারান্দা থেকে একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দাঁড়িয়ে আছ যে কেষ্টদিদি ?'

কৃষ্ণভামিনী সেদিকে না তাকিয়ে বলল, 'দেখছি।'

ঃ কাকে ?

ঃ মরণকে।

মেয়েটি হেসে বলল, 'বুঝিছি। তোমার খোলঞ্চিকে তো ? তা' সে মিন্‌সেকে তো দেখলাম, একটু আগে ভেঁপু ফুঁকতে ফুঁকতে, রিকশা চালিয়ে একটা লোক নিয়ে গেল পাড়ার মধ্যে।'

কথা শেষ হতে না হতেই হর্ণ বাজিয়ে একটা সাইকেল রিকশা এসে দাঁড়াল কৃষ্ণভামিনীর দরজায়। রিকশায় যাত্রী নেই। রিকশাওয়ালা নেমে একটু অপ্রতিভ মুখে হাসল কৃষ্ণভামিনীর দিকে চেয়ে।

কালো মানুষ। পেটা পেটা শক্ত চেহারা। বাবরি চুলও কালো। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ। এ সব মানুষ একটু বয়স-চোরা হয়। ধরা যায় না কিছু। কালো মুখে ধুলো লেগে রুক্ষ দেখাচ্ছে। সদ্য রিক্‌শা চালিয়ে ফুলে উঠেছে হাত পায়ের পেশী। অপ্রতিভ হ'য়ে হাসলে তাকে বোকা দেখায়।

ভ্রূ বাঁকিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণভামিনী, 'ক'টা বেজেছে ?'

সে বলল, 'এট্টুস্ দেরী হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণভামিনীর রাগ চড়ল তার কথা শুনে। বলল, 'রিক্‌শা চালিয়ে খাবে, ওই চালিয়ে মরবে। ভগবান তোমার হাতে কেন শ্রীখোল দিয়েছিল, বলতে পার ?'

অন্য মেয়েটির কথানুযায়ী বোঝা গেল, লোকটি কৃষ্ণভামিনীর খোলুঞ্চি অর্থাৎ খোল বাজিয়ে। নাম গগন। হেসে বলল

'ভগবানের বিষয় বলে কথা? কি যে কে হয়, কেউ জানে? পয়সার কাজটা আমাকে করতে হবে তো! না, কি বলো গো।'

ব'লে পূবের বারান্দার মেয়েটির দিকে তাকাল। কৃষ্ণভামিনীর কৃষ্ণচোখের তারা জ্বলে উঠল দপ্ দপ্ করে। চতুর্থ ঋতু অগ্রহায়ণেও বৈশাখের বিদ্যুৎবহ্নি। তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, 'ও আবার কি বলবে? আমিই বলছি, না পোষায় ছেড়ে দিলেই পার। আমার কি শ্রীখোল-বাজিয়ের অভাব হবে, না তোমাকে পয়সা আমি দিতে চাইনি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী মানছ লোককে, ন্যাকামো ক'রে তবে মরতে আসা কেন এখানে?'

বলতে বলতে ভিতরে ঢুকে গেল কৃষ্ণভামিনী। দাঁড়িয়েছিল রাণীর মত, ফিরে গেল ক্রুদ্ধা রাজেন্দ্রাণীর মত। দরজাটির পাল্লা নেই। নইলে বন্ধ ক'রে দিয়ে যেত।

বিমর্ষ হেসে গগন ফিরে তাকাল পূবের বারান্দার দিকে। সে মেয়েটি, গগনকে নয়, কৃষ্ণভামিনীকে ভেংচে চলে গেল।

বাড়ির দরজাটি বড়। সেকেলে বড়লোকের বাড়ি ছিল এটা। বাড়িটা নেই। পাঁচিল আর দরজার মাথাটা রয়ে গেছে। রিকশাটা ঢুকিয়ে দিল গগন উঠোনে।

ভিতরে তখন কৃষ্ণভামিনী হাঁক দিয়েছে, 'রাধি, ও রাধা, কোথায় গেলি?'

রাধা ছুটে এল ঘরে। ডাগর-সাগর রাধা, কটা রং। ছোট ছোট চোখে ডাগর চোখের ঢুলুনি। ঠোঁট দুটি বড় লাল, একটু স্থূল। কৃষ্ণভামিনী বলল, 'নে হারমনিয়াটা টেনে নে।'

রাধা বলল, 'খোলুঞ্চি খুড়ো এল না মাসী?'

কৃষ্ণভামিনী দেয়ালের পেরেক থেকে খঞ্জনি জোড়া পেড়ে ধমকে উঠল, 'তুই বোস্ দিকিনি। শ্রীখোল ছাড়াই হবে। পোষ মাসের আর ক'টা দিন মাত্তর বাকী। নবদ্বীপ থেকে বাবাজীর চিঠি এসে পড়েছে। দোসরা মাঘ বেরুতেই হবে। আমার কাজ আছে।'

রাধা চোরা চোখে মাসীর মুখ দেখে আর কথা বাড়াল না। ওই মুখের কাছে মুখ বাড়ানো যায় না।

প্রতি বছর মাঘ মাসেই কৃষ্ণভামিনী নবদ্বীপে যায়। মাঘ মাস ভোর, ভোর-সকাল নবদ্বীপে, আখড়ায় আখড়ায় মন্দিরে মন্দিরে কীর্তনের আসর বসে। নবদ্বীপের চেহারা বদলে যায়। স্বয়ং বিষ্ণু অবতরণ করেন। লোকে মাঘে যায় প্রয়াগে, বৃন্দাবনে, মথুরায়। ত্রিবেণীতে কল্পবাস করে। আর নবদ্বীপে আসেন নামকরা মহাজনেরা, মহাশয় বৈষ্ণবেরা। ত্রৈলোক্য আচার্য, কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য, মোহিনী মোহন মল্লিক, এই সব বড় বড় পণ্ডিত, লেখাপড়া জানা, বৈষ্ণব গায়কেরা আসেন। পদ রচনা করেন, ভাঙ্গেন গড়েন, পুঁথি নিয়ে বসেন বড় বড়। আসর হয়, এক একদিন এক এক আখড়ায়। সে আসরে স্কুল কলেজের ছাত্র মাষ্টার মশাইরাও ভিড় করেন এসে। নবদ্বীপের ওই সব আসরে কৃষ্ণভামিনীর বড় আদর। মহাশয়েরা স্নেহ করেন মেয়ের মত। বাবাজীরা তাকিয়ে থাকেন সতৃষ্ণ নয়নে। ভক্ত অভক্ত জনতার রক্তেও আখরের দোলা লাগে।

পানটি নেশার জিনিষ। নবদ্বীপেও ভোরবেলা স্নান ক'রে পানটি মুখে দেয় কৃষ্ণভামিনী। ঠোঁট রক্তরেখায় বেঁকে ওঠে। ধোয়া নীলাম্বরী প'রে, আঙ্গুল তুলে গায়,

বঁধু, তোমার দেওয়া গরবে,
তোমার গরব টুটাব হে।

নবদ্বীপে না গিয়ে পারে না কৃষ্ণভামিনী। আজকাল, শহরে বাজারে আর তাদের বড় একটা ডাক পড়ে না। বায়স্কোপ থিয়েটার, রেডিও রেকর্ডে অনেক কীর্তন শোনে লোক। কত শত মিঠে গলায় বাহারে পদের গান। তা ছাড়া দিন গেছে বদলে। কৃষ্ণভামিনীর দেহ ও বয়সের ধারায়, যুগটা পাশ কাটিয়ে গেছে অন্যদিকে। পাড়াতে আদর ডাকতেও নাকি অসম্মান। সাইনবোর্ডটা ঝুলানো আছে এক যুগ ধরে। ওইটি দেখে কোনদিন কেউ ডাকতে আসেনি তাকে। সাইনবোর্ডটির বয়স বেড়ে গিয়ে টিন বেরিয়ে পড়েছে।

তাই নবদ্বীপ যেতে হয়। সেইখানে কিছু বায়না পাওয়া যায়। এখনো দূর জেলা থেকে ডাক আসে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, আরো তলায় মেদিনীপুর, উঁচুতে মানভূম—প্রবাসের বাঙ্গালীরা ডাকেন কখনো সখনো। কীর্তনের খোঁজে সবাই নবদ্বীপেই আসেন এখনো। কৃষ্ণভামিনী কাছে না থাকলেও বাবাজীরা ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় এখানে। না গিয়ে উপায় কি!

বছর ছয়েক আগে, রাধামাধব আখড়ার রাখহরি বাবাজী একদিন গানের শেষে এসে বলেছিল, 'কেষ্ট, আচায্যি মশাই বলছিলেন, এবার তোমার আখেরটা একটু দেখতে হয়।'

ধ্বক ক'রে উঠেছিল কৃষ্ণভামিনীর বুক।—'কেন বাবাজী? গান জমেনি?'

বাবাজী বলেছিল, 'রাধেমাধব! এমনটি আর কার জমে গো। আচায্যি বলছিলেন, কেষ্টর বয়স হল। আখেরের কিছু না করলে শেষ বয়সটা…'একটু থেমেই আবার বলেছিল, 'তোমার কথা সবাই ভাবেন। তাই বলছিলাম, সব গুটিয়ে স্থুটিয়ে একেবারে নবদ্বীপেই চলে এস। শেষ বয়সটা রাধামাধবের সেবা ক'রে '

ধ্বকধ্বকানিটা থেমেছিল, যন্ত্রণাটা বুকের কমেনি কৃষ্ণভামিনীর। শেষ বয়স! যে কথাটি অনেকবার তার রক্তস্রোত বলে গেছে কানে কানে, আজ সকলে মিলে বলছে সেই কথা। সময় হয়ে এসেছে। বেলা যায়, বেলা যায়। কৃষ্ণভামিনী বুঝেছিল, শুধু তার রূপ নয়, আরো কিছু আছে। বিলাপের ছই জায়গায় স্বর ছিঁড়ে গিয়েছিল। বুক ভবে দম নিয়ে, গলার শির ফুলিয়েও শেষরক্ষে হয়নি।

বাবাজী আরো বলেছিল, 'গলার আর দোষ কি বল। যেখানে আছ, সেখানে থাকলে অনাচার তো একটু হবেই।'

অনাচার অর্থে নেশা ভাং আর শরীর পীড়নের ইঙ্গিত করেছিল বাবাজী। একেবারে মিছে বলেনি। কিন্তু নবদ্বীপে এসে থাকলে কি সে সবের কিছু কম্‌তি হবে? একে তো সে-আশ্রয় হবে পরের

আশ্রয়। কৃষ্ণভামিনীর তাতে বড় ঘৃণা। আর, রাখহরি বাবাজী যখন ভালোবাসবে, তখন? অমন ঢুলঢুল চোখ বাবাজীর, কেষ্টকে ভাল না বেসে তার উপায় কি।

সে ভালোবাসার আশ্রয় তো সইবে না তার।

তবে আখেরের ব্যবস্থা করেছিল কৃষ্ণভামিনী। মালীপাড়ার মেয়ে সে, নিজের জীবন তাকে শিখিয়েছে অনেক কিছু। রাধাকে পেয়েছিল সে আটবছর বয়স থেকে। আরো বারো বছর খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছে, গান গেয়ে, দেহ পণ্য ক'রে। কীর্তনে দীক্ষাও দিয়েছে অনেকদিন। মালীপাড়ার কারবারে ছেড়ে দেয়নি পুরোপুরি। মেয়েটার রং ঢং আছে। গলাটি একটু খর, তবে মন্দ নয়। কিন্তু বড় মাথা মোটা। দিন রাত্রই সেজে গুজে আছে। সন্ধ্যে হলেই উঁকি ঝুঁকি মারবে এদিকে ওদিকে। মালীপাড়ার মন্ত্র পড়ছে তো কানে দিবানিশি। এখন রক্তে বড় জ্বালা।

প্রথম দিকে শেখাবার অতটা চেষ্টা ছিল না কৃষ্ণভামিনীর। গত দু'বছর থেকে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরেছে সে রাধাকে। তালিম দিচ্ছে চুলের মুঠি ধরে। গতবছর নবদ্বীপের বায়নার জায়গায় জায়গায় নিয়ে গেছ্ল তাকে।

আখেরের ব্যবস্থা করেছে সে। কাউকে বলে দিতে হয়নি। তার গান, গায়িকা কৃষ্ণভামিনী, তারও যে আখের আছে, সেকথা ভেবে কেন মন পোড়ে।

বঁধু, পীরিতি করিয়া রাখিলে যদি,
অভিসার নিশি কাটে কেন।
না রাখিতে নিশি কাটেনা যেন।

খঞ্জনিতে দু'বার ঝুন ঝুন ক'রে কৃষ্ণভামিনী বলল, 'নে, মানের গানটা ধর।'

রাধা উস্‌খুস্‌ করছে। এ বাড়িতে আরো তিনঘর মেয়ে আছে। এ সময়ে তাদের কাছে ব'সে রাধা তাদের বাসরলীলার কাহিনী শোনে। বলল, 'কোনটা?'

ঃ কালকে যেটা হয়েছে।

ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমার মনে পড়ছে না মাসী।'

কৃষ্ণভামিনী রাগে জ্বলে উঠল। বলল, 'তা তো তোর মনে পড়বে না। চিরকাল বারোভাতারি তোর কপালে আছে, খণ্ডাবে কে।'

তারপর একমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে গুন্ গুন্ করে উঠল সে।

তুমি সুনাগরী রসের আগরী
তেজহ দারুণ মান।
সখীর বচনে কমলনয়নী
ঈষৎ কটাক্ষে চান।...

রাধা গান ধরতে না ধরতেই, গগন এসে ঢুকল। কৃষ্ণভামিনী চেয়েও দেখল না। রাধার ভ্রূ দুটি নেচে উঠল শুধু।

এ আসরে সে নিতান্ত বেমানান। ময়লা হাফসার্ট গায়ে, তালিমারা ফাটা ফুলপ্যান্ট পরা রিকশাওয়ালার সঙ্গে কোন মিল নেই এ ঘরের। এ ঘরের সাজানো গোছানো অল্পসল্প জিনিষ, পরিষ্কার যুগল শয্যা, সব কিছুতেই বিপরীত।

দেয়াল থেকে খোলটি পেড়ে, কপালে ঠেকিয়ে একটু দূরেই বসল সে। কৃষ্ণভামিনীর চোখের পাতা নড়ল না। কিন্তু খঞ্জনীর রিনিঠিনি খোলের বোলে একাত্ম হয়ে গেল। রাধারও গলা ছাড়ল।

গগন লোকটি এ তল্লাটের নয়। বছর দশেক আগে, বর্ধমানের এক গ্রাম থেকে, চলে এসেছে কৃষ্ণভামিনীর পিছনে পিছনে। কৃষ্ণভামিনী গাইতে গিয়েছিল সেখানে।

লোকটির পেছু নেওয়া নজরে ছিল তার। দেখেই বুঝেছিল, অন্তঃসারশূন্য গেঁয়ো বাউণ্ডুলে। ঘর বউ জোটেনি কপালে। রেস্ত থাকলে একটু আসকারা দিত হয়তো কৃষ্ণভামিনী। মাগনা পীরিতে মন্ দূরের কথা, সখও ছিল না একটু।

লোকটি কয়েকদিন এদিক সেদিক ক'রে হঠাৎ এসে বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে এট্টুস্ খোল বাজাব ভাই।'

আজকে যেমন অপরাধীর মত হেসে এসে দাঁড়াল, সেদিনও তেমনি ক'রে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন কৃষ্ণভামিনীব শ্রাবণের খরস্রোত দেহে, আশ্বিনেব ঢল বয়সেব হিসেবে। চোখের পাতার নিঃশব্দ ঝাপটাতেই তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, পাবেনি। ওদিকে আবার গগনেব একটু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ছিল। বলেছিল, 'আমাব বং কালা, ট্যাঁকও কালা, একটু বাজাতে চাই খালি।'

বাজিয়েছিল। বাজিয়ে নিযেছিল কৃষ্ণভামিনী। তেওড়াব ঢংএ ডুগ্‌ঠুকী বাজাতে বাজাতে গোলাপী নেশাব মত ঢুলছিল গগন। আর চোখ দিয়ে যেন চাটছিল কৃষ্ণভামিনীকে। দেখে শুনে ভামিনী রং ফিবিয়ে কালেংড়া সুবে গেয়ে উঠেছিল,

মতলবে তোব মন ঠাসা,
ঘবেব ভাতে কাগেব আশা।
নাগব পথ দেখ হে॥

গগন দমেনি। একমুহূর্ত থেমে তাল চড়িযে দিযেছিল আড়খেমটার। এমন বাজিয়েছিল, পথ দেখানো যাযনি একেবাবে গগনকে।

তাবপব বছব চলে গেছে। নানান কাজ ক'বে, গগন বিকশা কিনে বসেছে এখানে। সাবাদিনে দুটি কাজ এখন। বিকশা চালানো, ওইটি পেটের। কৃষ্ণভামিনীব সঙ্গে খোল বাজানো, ওইটি শুধু সখ না আব কিছু, টেব পাওয়া যায়নি দশ বছর ধ'রে। এখন কৃষ্ণভামিনীরও দরকাব হ'য়ে পড়েছে তাকে। তবে, গগনের ওই লালাঝরা চোখ দুটিকে কোনদিন আস্কাবা দেয়নি সে। রিকশাওয়ালার কাছে, কীর্তন গায়িকা কৃষ্ণভামিনী বেচতে পারে না নিজেকে। মাগনা মানিনী নয়, কৃষ্ণভামিনীর মান আছে।

মালীপাড়ার মেয়েরা ফোসলায় গগনকে, 'কী আশায় আছ? না হয় রিকশাই চালাও, আর মেয়েমানুষ নেই এ সোম্‌সারে!'

আছে। কার ঘরে যাতায়াত নেই গগনের! তার রিকশাওয়ালা বন্ধুরা বলে, 'ওরে শালা, কেষ্টভামিনীর মধু যে চলে যাচ্ছে বছরে বছরে। যারা খাওয়ার তারা খেয়ে নিলে। তোকে ব্যাটা পাকাচুল বাছতে হবে ভামিনীর।'

গগন বলে, 'তা' জানি। চাকে মধু না থাক, মোম তো থাকবে। ভামিনীর পাকাচুল, সেও যে অনেক ভাগ্য।'

ঃ এই মরেছে, শালা কুত্তা নাকি রে।

গগন হাসে: মাথা গুঁজে সোয়ারি বয়। তখন বোঝা যায়, তারো বয়সে শীতের বেলা লেগেছে।

কৃষ্ণভামিনী তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মরণ! রিকশাওয়ালা হলেই অমন নোলা হয়।'

কথায় কথায় গগন দু' একবার, ভামিনীর বাড়ীতেই থাকবার প্রস্তাব করেছে। খাওয়াটা থাকাটা যদি এখানেই ব্যবস্থা হত, মন্দ হত না। ভামিনী উগ্রচণ্ডী মূর্তি নিয়ে তেড়ে এসেছে, 'বেরো বেরো বেরো।'

* * * *

রাধার ঠেকে ঠেকে যাচ্ছে। ভামিনী খঞ্জনির খুন্ খুন্ শব্দ থামিয়ে বলে, 'হল না। মুখপুড়ি, একটু হেসে গা। হারমোনিয়া ছাড়, খালি গলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা। আগে বল্ –'

ব'লে নিজেই বলে, 'সখি, আমার মন নেই, কাকে বল। আমার চোখ নেই, কাকে দেখাও! আমি বধির, শুনতে পাইনে সই। তবুও ওইখেনে কে দেখা দেয়? কে, ও?

সখি কেন কুঞ্জের ধারে দাঁড়িয়ে কালা,
ফিরে যেতে বল্।'

এদিকে গগনের হাত যেন অবশ। খোলে চাটি নেই। হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণভামিনীর দিকে। রুখে উঠল কৃষ্ণভামিনী, 'আ মরণ!'

মরবার আগেই ঘিচ্ ঘিচ্ করে খোল কথা বলে উঠল, ফিরে যেতে বল্।'

রাধা হাসে মিট্‌মিট্ ক'রে। জোরে হাসতে ভয় পায়। মাসী গলায় পা দেবে যে!

আশ্চর্য! রাধা চোরা চোখে বিজলী হানে গগনকে। তার কটা রংএর শরীরের রেখায় বড় ঝাঁজ। নেশা করার মত স্থূল টকটকে ঠোঁট দুটিতে যেন মনে মনে কি বলে। দেখেশুনে ঘেন্না করে কৃষ্ণভামিনীর। ছুঁড়ির রুচি বলে কিছু নেই। গগনের রকম সকমও তেমনি। রাধার হাসিতে ঢুলে ঢুলে খোল বাজায়।

বেলা গেল। পৌষের বেলা, এল কখন, গেল কখন, কে জানে। এর মধ্যেই ঘরের মধ্যে মশার শানাই বাজছে। স্থির হ'য়ে বসতে দেয় না একদণ্ড। ঘরে ঘরে, ধোয়া মোছা, সাজাগোজা চলেছে। বাতি জ্বলছে বারোবাসরে।

গান শেখানো শেষ হল। গগন উঠতে যাবে। কৃষ্ণভামিনী বলল, 'রাধি, রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস কর্, ওর খোলবাজাবার কত চাই।'

গগন বলল, 'খুব রেগে গেছ বাপু। দশ বচ্ছর যখন দেওনি, থাক। সবটা একসঙ্গেই দিও না হয়।'

কৃষ্ণভামিনী বলল, 'বাকী বকেয়া আমি ভালবাসিনে।' টান মেরে আঁচল নামিয়ে চাবির গোছা খুলতে খুলতে বলল, 'আর রাস্তার মানুষের সামনে, ছোটলোকের মুখে ছোট কথাও শুনতে চাইনে।'

কালো মুখে, হলদে চোখে গগনকে বোবা অসহায় জানোয়ারের মত মনে হয়। এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে বলল, 'আচ্ছা বাপু, আর কোনদিন কিছু বলব না। এবার থেকে সময়মত আসব।'

ব'লে না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। রিকশা বার করতে যাবে। দরজার পাশ থেকে রাধা বলল, 'চললে খোলুঞ্চি খুড়ো?'

গগন বলল, 'হ্যাঁ লো! তোর মাসীর যা রাগ!'

রাধা বলল ঠোঁট ফুলিয়ে, 'তা' বলে আমি তো আর রাগ করিনি।'

গগন বলল হেসে, 'করবি কেন। তুই তো আর কেষ্টভামিনী নোস্। তা' হ্যাঁরে, রাতে কেউ আসবে নাকি তোর মাসীর গান শুনতে?'

ঃ আজ? হ্যাঁ, ওপারের মথুর ভট্‌চায আসবে রাত দশটায়।

ঃ থাকবে বুঝি রাত্রে?

ঃ কী জানি। তুমি আসবে?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে গেল গগন। রাস্তার উপর থেকে কে একজন শিস দিয়ে উঠল রাধার দিকে চেয়ে। রাধা হাসল। মালীপাড়া জমে উঠেছে শীতের সন্ধ্যায়।

জুড়িয়ে এল রাত দশটাতেই। শীতে আপাদমস্তক ঢেকে কোঁকাতে কোঁকাতে এল মথুর ভট্টাচার্য। তার পিছনে পিছনে গগন।

কৃষ্ণভামিনী সেজেছে। শান্তিপুরের নীলাম্বরী তার বড় প্রিয়। রংটি মাজা মাজা হলেও মানায়। মুখে স্নো-প্লাউডার মেখেছে, জামার গলাটি একটু বেশী কাটা। চওড়া ঘাড়ে ও গলায় বয়সের ঢেউ পড়েছে। ঢাকা পড়েছে একটু চওড়া বিছে হারে। পানরাঙানো ঠোঁট, পায়ে আলতা। ভট্টাচার্যকে দেখে অভ্যর্থনা করল, 'আসুন, ভট্‌চায মশাই।'

মথুর বলল বুড়োটে গলায়, 'অ্যা? আসব? তা আসব। কিন্তু, তোমার সেই মেয়েটি, কি নাম তার? রাধা, হ্যাঁ রাধা! আজ তার মুখে একটু ভাব-সম্মিলনের গান শুনব। তোমার গান তো অনেক শুনেছি কেষ্টভামিনী।'

চকিত ছায়ায় এক মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণভামিনীর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। অনেক শোনা হয়েছে, অনেক। গান শুনবে লোকে, কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর দিন বুঝি আর নেই। ভাব-সম্মিলনের মিলন কোলাকুলির রস উপচে পড়বে না বুঝি আর তার গানে। পরমুহূর্তেই হাসল। পঞ্চম ঋতুর শীতার্ত শুষ্ক হাসি যেন। ভাল,

ভালই তো। সে আসল, রাধা যে তার সুদ। তারই গান শুনুক লোকে। বলল, 'বেশ তো, শুনবেন, বসেন।'

মথুর বসল। ভূতের মত বেমানান, তালি মারা প্যান্টটা পরে হাঁ ক'রে বোকা চোখে গগন তাকিয়েছিল ভামিনীর দিকে। চোখে চোখ পড়তে, চমকে খোল নামাল সে।

রাধা তখন অন্য ঘরে। ভামিনী বলল, 'বসুন, ডেকে নিয়ে আসি।' রাধাকে নিয়ে তখন অন্য ঘরে টানাটানি। ছাড়িয়ে নিয়ে এল ভামিনী। মথুর বলল, 'এস এস।'

পৌষ সংক্রান্তি গেল। উত্তরায়ণে বাঁক নিল সূর্য। সোনার মত রোদে, ছায়া বেঁকে গেল একটু দক্ষিণে। দিনের ঘোমটা খুলতে লাগল একটু একটু ক'রে।

দোসরা মাঘ রাধাকে নিয়ে রওনা হল ভামিনী। গগনও এসে, ঢাকা বারান্দায় তুলে দিল রিকৃশা। শ্রীখোল নিল কাঁধে। সেও যায়। না গিয়ে পারে না। বাজাবার বড় সাধ। দশ বছর ধ'রে নবদ্বীপে সেও চেনা হয়ে গেছে। কেষ্টভামিনীর খোলবাবাজী তার নাম হয়েছে। গগন বড় খুশী। আর, আজকাল অপরে খোল ধরলে একটু বাধ বাধ লাগে ভামিনীর। গগনের সেখানে বেশ নাম। তবে, বেশীদিন থাকতে পারে না। পেট চালাতে হবে তো। দু'চারদিন বাদেই ফিরে এসে রিকশা নামায়।

মালীপাড়ার মেয়ে পুরুষেরা বলে, 'কেষ্ট খেতে দিলে না বুঝি?'

গগন বলে, 'আমি কেন খাব?'

রওনা হল তারা। পাড়ার মেয়েরা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'মাগীর ঠ্যাকার দেখলে গা'জ্বালা করে।' স্টেশনে গিয়ে ভামিনী দুটি টিকিটের টাকা দিল গগনের হাতে। গগন তিনটি টিকিট কেটে নিয়ে এল।

নবদ্বীপে আসর জমে উঠেছে সংক্রান্তির দিন থেকেই। সকলেই অভ্যর্থনা করল কৃষ্ণভামিনীকে। আখড়ায়, মন্দিরে, চেনাশোনা

বাড়িতে। রাধাকে গতবছরই সবাই দেখেছে। গতবছর রাধা বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। তবে, রাধার কাছ ঘেঁষাঘেঁষির জন্য সকলেই বড় ঠেলাঠেলি করেছে। গগন খোলুঞ্চিকেও চেনে সকলে। রাখহরি বাবাজীর আখড়াতেই আস্তানা নিল ভামিনী।

মহাজন মশাইয়েরা এসে ঠাঁই নিয়েছেন এক এক জায়গায়। আসরে দেখা হয় সকলের সঙ্গে। সকলেই ডেকে ডেকে কুশল জিজ্ঞেস করলেন ভামিনীর।

পরদিনই গানের আসরে বসল ভামিনী। লোকারণ্য হল সেই আসরে। প্রথম দিন। সে কৃষ্ণ রাধা ভজল, খোল করতাল ভজল, মান্য গণ্য মহাজন গুরুজন ভজল। তারপর ধরল,

প্রভু না বাঁধিয়ে টানো,
কী যে টানে টানো
আমারে জনম ভরিয়ে টানো।
পীরিতি রশিতে বাঁধিয়া টানো।
টানো হে।
ধূলায় পড়ে, কাঁটায় ফুটে
রক্ত ঝরে, জ্বালায় পুড়ে,
মরিব, তবু টানো হে নাথ॥

অনেক্ষণ গাইল ভামিনী। কিন্তু তেমন সাড়া শব্দ পড়ল না। নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগল ভামিনীর। ঠোঁট শুকিয়ে উঠতে লাগল। চোখের কটাক্ষে সেই রং ফুটছে না। সুরের দোলায় দোলায় হাত উঠছে না তেমন ক'রে।

এক ফাঁকে বাইরে এল। রাখহরি বলল, 'কি হয়েছে তোমার কেষ্ট?'

ঃ কেন?

ঃ গলায় যে তোমার বয়সা ধরেছে।

বয়সা? হেসে উঠল ভামিনী। বলল, 'এ বয়সে আবার বয়সা কি বাবাজী? সে তো ছেলেমানুষের ধরে।'

রাখহরি বলল, 'এ বয়সেও ধরে গো! গলায় তোমার দোআঁসলা জট পাকাচ্ছে কেন?'

দোআঁসলা জট! আচমকা শীতের কাঁপ ধরে গেল যেন ভামিনীর বুকে।

হেসে বলল, 'একটু চা খেয়ে নিতে হবে।'

রাখহরি ভামিনীর আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ চোখে দেখে হঠাৎ মিষ্টি হেসে বলল, 'থাক্ না। এবার না হয় থাক্। তোমার রাধাকে গাইতে দাও। দেখা যাক্ কেমন শিখেছে।' রাখহরির চোখের দিকে তাকিয়ে ভামিনীর রাঙ্গা শুকনো ঠোঁটও বেঁকে উঠল। কিন্তু গাইতে বলল রাধাকেই।

রাধা ভ্রূ তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে গাইল,

আমারে, অবলা পেয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে
বাঁধিলে পীরিতি ফান্দে।
অতি অভাগিনী কুট নাহি জানি
ফান্দ খোলে কি ছান্দে॥

গলা একটু খরো। কিন্তু কাঁচা গলার চড়া সুরে, আর কাঁচা বয়সের কিশোরী ঠমকে আসর গুণ্ গুণ্ ক'রে উঠল। কোথায় ছিল আসরের এই হাসি ও আনন্দাশ্রু।

অন্ধকার চেপে আসছে কৃষ্ণভামিনীর মুখে। তবু হাসছে। শীত, বড় শীত। গুড়্গুড়্ ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠছে বুকের মধ্যে। কেন? চুলের মুঠি ধরে যাকে শিখিয়েছে, সেই রাধার গুণে বলিহারি যাচ্ছে সব। তার সুদের ঐশ্বর্য।

স্বয়ং মোহিনী মল্লিক মহাজন আশীর্বাদ করলেন ভামিনীকে, 'বাঃ বেশ! শুধু আখেরের স্বার্থে এমনটি শিখুনো যায় না মা। তুমি, সত্যিকারের আখেরের কাজ করেছ।'

বড় সুখ, তবু মুচড়ে মুচড়ে ওঠে বুক। কীর্তন গায়িকা কৃষ্ণভামিনী আর নেই, আখেরের কাজ আছে। এমন মহাজন কেন হল না ভামিনী, যে সুদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে।

কেবল ছুটো দিন গগন চুপচাপ খোল বাজাল। আর অপলক চোখে চেয়ে দেখল ভামিনীকে। যতবার চোখাচোখি হল, তার হ্যাংলামো দেখে ভামিনী বিরক্ত হয়ে ফিরিয়ে নিল মুখ। মরলে ওকে হাড় ক'খানা চিবুতে দিয়ে যাবে।

ছুদিন পরে, গগন বিদায় নিল। বলে গেল, আবার আসবে মাঘেই।

ভামিনী মনে মনে বলল, পাছ ছাড়লে বাঁচি।

তারপর গান চলল আখড়ায় আখড়ায়। রাধা এবার ভাসিয়ে দিল নবদ্বীপ। যা গায়, সবই মানিয়ে যায়। একদিন কৃষ্ণভামিনীরও যেত। যা করত, যা বলত, যা গাইত, তাই ভাল লাগত লোকের। খরস্রোতা কৃষ্ণভামিনীকে দেখছে সে রাধার মধ্যে। সবাই রাধার পিছনে পিছনে।

রাত্রে রাধাকে বুকে নিয়ে আদর করল ভামিনী। বলল, 'রাধি, আমার মান রেখেছিস্ তুই, মান রেখেছিস্।'

বলতে বলতে চোখ ফেটে জল এল। রাধা অবাক হল। একটু বিরক্তও। বলল, 'এ আবার তুমি কি স্নুরু করলে বাপু। ঘুমোতে দেও।'

ঘুমোতে দিল তাকে। নিজের হাতে ভাল করে কম্বল ঢেকে দিল। হয়, এমনটি হয়। এত জনে জনে, মহাজনে, সবাই মিলে চোখে মুখে তাকে বন্দনা করছে। হবে না। এক সময়ে কৃষ্ণভামিনীরও যে হয়েছিল।

আসরে আর ভাল করে ভামিনীকে কেউ সাধেও না। রোজ গাওয়াও হয়না তার। তবু আসরে আসরে থাকতে হয়, বসতে হয়।

বায়না পাওয়া গেছে কয়েকটি। বায়নার সর্ত রাধা, তবে কৃষ্ণভামিনীকেও চাই। চাই বৈকি। স্নুদকে একলা ছাড়বে কি ক'রে সে।

মাঘের শেষে এল আবার গগন। এসে দেখল, ভামিনীর চোখের কোলে কালি। মুখখানি শুকনো। চলতে ফিরতে, পিঠে

ব্যথা, কোমরে ব্যথা। যেন এতদিনে সত্যি সত্যি বুড়ি হয়ে গেছে সে। পা ছড়িয়ে বসে। তেমন সাজাগোজা নেই। যেন মালীপাড়ার সুকী মাসী।

গগন বলল, 'শরীলটা তোমার খারাপ দেখছি যে!'

মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল ভামিনী, 'শরীলটা ছাড়া বুঝি আর কিছু দেখতে পাওনা ওই মরাখেগো চোখে।'

গগন বলল, 'তাও দেখতে পাই।'

ঃ কী দেখতে পাও?

ঃ তোমার দুঃখু।

ঃ মরে যাই আর কি! উনি এলেন আমার দুঃখু দেখতে, হুঁ!

তারপর হঠাৎ কি হল ভামিনীর। ভীষণ ক্ষেপে উঠল, বলল, 'গতরখেগো মিন্‌সে, আর কবে ছাড়বে পেছন? ম'লে? তবে আগে মরি, তা' পরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেও।'

গগন একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলল, 'আচ্ছা তাই হবে, তাই হবে, তুমি চুপ কর এখন।'

ব'লে সরে পড়ল।

মাঘমাসের শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে, যাত্রা শুরু হল। গুটি সাতেক বায়না আছে। কৃষ্ণনগরে, চোত্‌খণ্ডে, রামপুরহাট, ধানবাদে, গোটা দেশটায় প্রায়।

সব জায়গাতেই সবাই ছুটে এল কৃষ্ণভামিনীর নাম শুনে। মুঠি ভরে পয়সা আর বাহবা দিয়ে গেল রাধাকে। তবে, কৃষ্ণভামিনীকেও বাহবা দিয়েছে সবাই। সে নইলে, এমন মেয়ে সাকরেদ আর কার হয়।

চোতখণ্ড অবধি সঙ্গে রইল গগন। ওখানেই কাছাকাছি তার জন্মভূমি। সে বিদায় চাইলে ভামিনী বলল, 'আগে বলনি কেন? আমার খোল বাজাবে কে?'

গগন বলল, 'পেটের ব্যবস্থা দেখতে হবে তো আমাকে। ট্যাঁক যে ফাঁক।' ভামিনী বিরক্ত হয়ে বলল, 'না হয় খেতেই দেব।'

হলদে চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল গগন, 'তা পারবনা বাপু আমি। খোল বাজিয়ে যোগাড় ক'রে দিয়ে যাচ্ছি।'

সেইদিনই বর্ধমান শহর থেকে জুটিয়ে দিয়ে গেল একজনকে। ভামিনী ঠোঁট উল্টে বলল, 'মুরোদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান। আপদ কোথাকার! ও আবার খাবে খোল বাজিয়ে!'

পয়লা বৈশাখ ফিরে এল কৃষ্ণভামিনী আর রাধা। রোজগারে একটু ভাঁটা পড়েছিল কয়েকবছর। এবার সুদ শুদ্ধ আদায় ক'রে নিয়ে এসেছে ভামিনী। কিন্তু বুকের কাঁটার মত একটা লোক পেছন নিয়েছে বর্ধমান থেকে। যত জায়গায় তারা গেছে, সব জায়গায় গেছে লোকটা। ভাবও হয়েছে খুব রাধার সঙ্গে। রাধার আস্কারাতেই এখানেও ছুটে এসেছে।

বুকে বড় ধুকুপুকু ভামিনীর। গগনের মত হলেও ভাল ছিল। কিন্তু লোকটি অল্পবয়সী পয়সাওয়ালা উগ্রক্ষত্রিয় ঘরের ছেলে। সহজে ছাড়বে না। ভাব জমাবার চেষ্টা করেছে ভামিনীর সঙ্গে। রাধাব সঙ্গে পীরিত হয়েছে। একেবারে দূর দূব করতে পারেনি।

ফিবে এসে বাধা বলল, 'মাসী, লোকটা কিন্তু দুদিন থাকবে এখানে।'

ভামিনী গম্ভীর গলায় বলল, 'না।'

রাধা ফুঁসে উঠল, 'হ্যাঁ, থাকবে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণভামিনী। কিন্তু সে তেজ নেই তার। নিস্তেজ গলায় বলল, 'মুখপুড়ি, বেশী অত্যাচার করলে গলাটা যে যাবে।'

রাধা হুকুমের সুরে বলল, 'যাক্। গলার জন্যে কি কারুর ঘরে লোক আসা বাদ ছিল?' অন্ধকার মুখে চুপ ক'রে রইল ভামিনী। বুকটার মধ্যে পুড়তে লাগল চাপা আগুনে। চোখের মণিতে সে আগুন নেই। অঙ্গুলি সংকেতের সেই নির্দেশ নেই। রাজেন্দ্রাণী কৃষ্ণভামিনী নেই।

সারা বাড়ি মজা দেখল। রাধা আর তার লোকটিকে নিয়ে গুলজার করল সবাই। মালীপাড়ার বুড়ি ছুঁড়ি সবাই বলল, 'মাগীর তেজ একটু কমেছে।'

কিসের তেজ। কোন তেজ তো কোনদিন ভামিনী দেখায়নি কাউকে। সে যা, তাই তো সকলের কাছে তেজ।

গগন এল যথাপূর্বং। আসতে লাগল রোজ আগের মতই। রাধার লোকটি বিদায় নিয়েছে। সব সময় ভামিনীর কথা মানে না রাধা। তবু, ঝগড়া করে, টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে বসে ভামিনী। গান হয়। খোল বাজায় গগন।

রাধাকে দেখাতে গিয়ে গলা খুলতেও লজ্জা করে কেন যেন ভামিনীর। সপ্তমে বাঁধা রাধার গলা টং টং ক'রে বাজে। ভামিনীর গলা বেসুরো ঢ্যাবঢেবে শোনায় সেখানে। অপ্রতিভ হয়ে খ্যাকাবি দেয়, আবার তোলে গলা। 'বলে, নে বল্ '

রাধা বলে,' 'থাক্ বাবু, তুমি বরং একটু শুয়ে থাকোগে।'

ব'লে উঠে যায়। কথা সরে না ভামিনীব মুখে। শুধু বসে থাকে, চুপ ক'রে। হঠাৎ এক সময়ে খেয়াল হয়, মুখোমুখি খোল কোলে ক'রে বসে আছে গগন। ভ্রূ কুঁচকে বলে, 'বসে আছ যে?'

গগন বলে অপ্রতিভ হেসে, 'যদি এট্টু গাও, তা'হলে বাজিয়ে যাই।'

: কে, আমি? রস যে প্রাণে ধরে না দেখছি। গাইব এবার ঘাটে গিয়ে, পালাও পালাও।

আরো একটি বছর গেল এমনি। রাধার সেই পীরিতের ছেলেটি এসেছে মাসে একবার ক'রে। এ বছরও ঘুরেছে সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গে মালীপাড়ায়ও এসেছে। এবার ফিরে এসে রাধা দুদিন বাদেই বলল, 'মাসী, আমি চলে যাব।'

ধ্বক্ ক'রে উঠল কৃষ্ণভামিনীর বুকের মধ্যে। চার বছর আগে রাখহরির কথায় এমনি ধ্বক্ ক'রে উঠেছিল। গানের গলা নেই,

আজ কথা বলবারও গলা নেই ভামিনীর। হাঁ করে তাকিয়ে রইল রাধার নির্বিকার দৃঢ় মুখের দিকে। খানিকক্ষণ পর বলল, 'কোথায় যাবি ?'

ঃ ওর সঙ্গে।

ওর মানে, সেই পীরিতের লোকটির সঙ্গে। বুকের মধ্যে কন্‌কন্ করছে কৃষ্ণভামিনীর। পঞ্চম ঋতুর দারুণ শীতে নেমেছে হিমপ্রবাহ। গলা গেছে, গান গেছে, ধমক ঠমক গেছে। সুদ যাচ্ছে আজ, আসল খেয়ে গেছে কবে। মথুর ভটচাযরা কবেই ছেড়ে গেছে। টাকা পয়সা সোনাদানাও কিছু রাণীর ঐশ্বর্য নেই। এ বয়সে আর কিসের বেসাতি করবে। কে আসবে এ ঘরে।

ভামিনী বলল, ভীত করুণ চোখে তাকিয়ে বলল কীর্তন গায়িকা কৃষ্ণভামিনী, 'যাবি মানে ? তোকে খাইয়ে পরিয়ে বড় করলাম, শেখালাম পড়ালাম, আমাকে কোথায় রেখে যাবি ?'

রাধা বলল কট্‌কট্‌ ক'রে, 'খাইয়েছ পরিয়েছ বলে, আইন নেই যে, তুমি আমাকে চিরদিন ধবে বাখবে। মন চাইছে যাকে, তার সঙ্গেই চলে যাব।'

মন চেয়েছে ! এ বুঝি ভালবাসা। থিয়েটার বায়স্কোপে এমনি পীরিতের আজকাল নাকি বড় ছড়াছড়ি। কিন্তু তুদিনে যে তেজ ভেঙ্গে যাবে। ঘবের বউ না, কুলটা। তোকেও যে একদিন এমনি কবে এক রাধাকে খাওয়াতে পরাতে হবে।

গম্ভীর গলায় বলল ভামিনী, 'যা !'

এমন আচমকা আর নিবিকার ভাবে বলল ভামিনী যে, রাধাও একমুহূর্ত থমকে রইল। কুঁকড়ে উঠল ঠোঁট তুটি।

ভামিনী বাইরের দরজার কাছে গিয়ে দক্ষিণ দিকে দেখল। একটা রিকশাওয়ালা যাচ্ছিল। তাকে বলে দিল, 'তোমাদের গগন রিকশাওয়ালাকে একটু ডেকে দিও তো।'

ওদিকে যাবার তাড়া লেগেছে। আর তিন ঘরের মেয়েরা সবাই হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। খবর রটেছে সারা মালীপাড়া।

সবাই একবার ক'রে দেখতে আসছে রাধা আর তার নাগরকে। রাত দশটায় চলে যাবে ওরা।

ভামিনী বসেছিল বাতি জ্বালিয়ে। মনটা বড় গান করতে চাইছে, পারছে না ওদের কথার ফিস্‌ফিস্‌ খিল্‌খিল্‌ হাসিতে।

একটু পরেই এল গগন। বলল, 'তুমি নাকি ডেকেছ?'

ভামিনী বলল, 'হাঁ। বলছিলাম, আমার একটা লোক দরকার। রোজগেরে লোক। আমাকে রাখতে পারে এই রকম।'

কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে রইল গগন। বৈশাখ মাস। সারা গায়ে ধুলো বালি গগনের। কালো মুখে ঘাম। তারপরে হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে হাসল গগন। অন্যদিকে চেয়ে বলল, 'তা' আমাকে যদি বল…এখনো রিক্‌শাটা চালাই, রোজগারও হয়। আমি তোমার কাছে থাকতে পারি।'

ভামিনী বলল, 'তোমার যদি মন চায়। থাকা তো নয়, আমাকে রাখাও বটে।'

গগন বলল, 'তা তো বটেই। তবে আজকের রাত থেকেই থাকি?'

কৃষ্ণভামিনীর চোখে যন্ত্রণা ও ঘৃণা। বলল, 'এস।'

: 'খাওয়াটাও আজ থেকে তা'হলে এখানেই হবে?

: তাই হবে।

গগন বেরিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল। একটু খাটো হলেও কোঁচা দিয়ে আজ ধুতি পরে এসেছে গগন। গায়ে ক্ষারে কাচা জামা, গলায় একখানি সুতীর চাদর। পায়ে অবশ্য টায়ার কাটা স্যাণ্ডেলটি-ই আছে।

এই বেশে তাকে রিকশা চালিয়ে আসতে দেখে সবাই হৈ চৈ ক'রে উঠল। ভামিনীর বাড়ির মেয়েরাও হেসে কুটিপাটি। ওমা! একি খোলুঙ্কি খুড়ো!

ওদিকে যাবার সময় হল। বিদায় নিল রাধা, গগন আর ভামিনীর কাছ থেকে। ভামিনী নীরব। গগন বলল, 'সুখে থাকিস্, বুঝে চলিস।'

চলে গেল ওরা। তারপরে সবাই উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল ভামিনীর ঘরে।

ভামিনী রান্না শেষ করল। চোখ না তুলে, মাটির দিকে চেয়ে আসন পেতে খেতে দিল গগনকে। খাওয়া হলে, গা ধুয়ে, ধোয়া কাপড় পরে গগনের সামনে এসে দাঁড়াল। হাসবার চেষ্টা করছে, পারছে না। বুকটা বড় ধড়ফড় করছে। ঠাট বাট করতে হবে। কিন্তু রক্তে সে দোলা নেই। বয়সের ভারে অচল।

তবুও হেসে তাকাল। চোখের চারপাশে কোঁচ পড়েছে। সেই চোখে অসহায় ইঙ্গিত। গগন হেসে মাথা নামাল।

দরজা বন্ধ করল ভামিনী। জানালা বন্ধ করল। বাতিটা কমাল, কিন্তু জ্বলতেই লাগল। সামান্য অস্পষ্টতা। তারপর কাছে এসে হাত ধরল গগনের।

গগন চমকে উঠে বলল, 'কই, হাবমনিয়া পাড়লে না?'

ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে বলল ভামিনী, 'কেন?'

: গাইবে না?

কৃষ্ণভামিনী বলল, 'শোবে না?'

তেমনি অপ্রস্তুত ভাবে হাসতে গিয়ে আজ প্রথম গগনের মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। বলল, 'কেষ্টভামিনী, ওইটির জন্য তোমার কাছে আসিনি। তুমি যা দেবে, সব নেব। কিন্তু তুমি কেষ্টভামিনী।' বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ঢোঁক গিলে বলল, 'তোমার কাছে থেকে বাজাব, তাই চেয়েছি এতকাল ধ'রে।'

বিস্মিত সংশয়ে ফিরে তাকাল কৃষ্ণভামিনী। পরমুহূর্তেই চোখে জল এসে পড়ল তার। রুদ্ধগলায় বলল, 'কেন?'

গগন বলল, 'বাবারে! সব ভুলে গেলাম কেত্তন-গায়িকে কেষ্টভামিনীর গান শুনে, সে কি ভুলতে পারি? আজ যদি ডাকলে, এট্টু বাজাতে বল আমাকে।'

কে বলবে। কে কথা বলবে। হৃদয়ের সব গান আজ আর এক গানের রসে যে গলা বুজিয়ে দিয়েছে।

হারমোনিয়ম পেড়ে দিল্ গগন। শ্রীখোলটিতে কপাল ঠেকিয়ে কোলে নিয়ে বসল! বলল, 'গাও।'

হারমোনিয়মে সুর উঠল। কৃষ্ণভামিনী সুর দিল। সুর উঠল স্বর উঠল। সেই স্বরে পঞ্চম ঋতু পেরিয়ে ষষ্ঠ ঋতুর বাতাস লাগল।

সারা মালীপাড়াটা প্রেতিনীর মত ফিসফিস করে হাসতে লাগল, কেষ্টভামিনী আবার গাইছে গো!

সোনাটির বাবু

আড়ে আড়ে চেয়ে চেয়ে শিবির টেপা ঠোঁটের হাসিটা যেন গজলের প্রথম বিস্তারের মত ব্যাপারটাকে লহরার দিকে টেনে নিয়ে গেল। আর বিষ্টুপদ না-হাসি না-রাগ গোছের মুখে অপ্রতিভ তবলচির, ডুগিতে একটা শব্দ করে থেমে যাওয়ার মত জিজ্ঞেস করল, 'মাইরী?'

শুনে শিবি সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তার মিঠে গলায় খিল খিল ক'রে হেসে উঠল যেন তালফেরতা পেরিয়ে তবলায় বাজল দ্রুত রেলার বোল।

বলল, 'মাইরী আবার কি। মিছে বলছি বুঝিন?'

মনে হল বিষ্টুপদর মুখে একটা ঘুষি মেরেছে কেউ। সে প্রায় খ্যাক ক'রে উঠল, 'তাহ'লে সাত নম্বর?'

শিবি অমনি ঘোমটা একটু সরিয়ে ছোট মেয়ের মত মুখখানি বেজার ক'রে বলল, 'আমার দোষ নাকি? এই নিয়ে তো আট হ'ত, একটা চ'লে গেল, তাই...।'

বিষ্টুপদ হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। সে অবাক হ'য়ে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল শিবির দিকে।

তার বউ শিবি। লম্বা চওড়ায় দোহারা শরীর, মাজা মাজা রং, সাধারণ দুটো চোখ। বয়স প্রায় তিরিশ। বিচার করলে রূপ তার কিছুই হয়তো নেই। কিন্তু তার এ সাদাসিধে চেহারাটার মধ্যে কোথায় যেন এমন একটা অপরূপের ছোঁয়া লেগে রয়েছে যে, পেছন ফিরলে আবার ফিরে দেখতে হয়। তার বয়স হয়েছে, বয়সের দাগটা পড়েনি। যেন পাতি হাঁসটার হাজারবার জলে ডোবানো, তবু ঝরঝরে শরীরটার মত। মুখটা কাঁচাটে অর্থাৎ

রূপের যদি কোন কাঁচামিঠে স্বাদ থাকে, তবে তাই। ওই মুখে তার নিয়ত হাসির কারণ বোঝা দায়।

বিষ্টুপদর সাতসকালে এ বিস্ময় ও ক্ষুব্ধতা এখানে নয়, অন্যত্র। সে ভাবছে, এই মেয়ে ন' বছর বয়সে তার ঘরে এসেছে, তেরো বছর বয়স থেকে যথানিয়মে সন্তান প্রসব ক'রে চলেছে। শরীর একটু টসা দূরে থাক, বিষ্টুপদ যখন জ্বালা-যন্ত্রণায় রোজই বলছে, 'এবার শালা কেটেই পড়ব', ঠিক তখনই শিবি সোহাগ করে, হেসে, খাপ্‌চি কেটে কেটে বললে কিনা, 'মিটুর দোকান থেকে এট্টুস্ নঙ্কার আচার এনে দেবে?' এই সামান্য কথাটাই একটা মস্ত সর্বনাশের মহাইঙ্গিতপূর্ণ বিষ্টুপদর কাছে। এই কথাটা যতবার সে শুনেছে শিবির মুখ থেকে, ততবারই তার পিতৃত্বের খঞ্জনি বেজে উঠেছে আঁতুড় ঘরে। যেন মৃত্যু ঘোষণা ক'রেছে বিষ্টুপদর। তাই সে খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়েই জিজ্ঞেস করেছে, 'মাইরী?' যেন তা'হলে সে শুনতে পাবে, 'না।' কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের মত শিবি হেসে উঠেছে খিল্ খিল্ ক'রে। উপরন্তু মুখ বেজার ক'রে বলছে, এই নিয়ে তার আট হ'ত। বোঝ, যেন গাছের ফল।

এক মুহূর্ত সে শিবির দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল যেন শিবি তার কোন নিষ্ঠুর আততায়ী। পর মুহূর্তেই মোটা ভাঙ্গা গলায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'নঙ্কার আচার না, এবার আমার মুণ্ডুটা এনে দেব। রইল শালার সম্‌সার আর ঘর আর রোজগার।'

বলেই ঘট্‌ঘট্ ক'রে বেরিয়ে যেতে যেতে তার সেই স্বভাবসিদ্ধ ইংরেজী কথা ক'টি শোনা গেল, 'অল শালা ব্লাডি বোগাস্।'

কাদের দুড়-দাড় ক'রে ছুটে পালাবার শব্দ শোনা গেল। আর কেউ নয়, বিষ্টপদর ভীত সন্ত্রস্ত ছেলেমেয়ের দল পালাচ্ছে বাপের খ্যাকানি শুনে। আর ছ'টি সন্তানের মা শিবি প্রায় একটি বালিকার মত অভিমানক্ষুব্ধ চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তারপর বালিকার মতই ঠোঁট কেঁপে চোখ ফেটে তার জল এল। কথায় বলে, মন গুণে ধন, দেয় কোন জন। শিবির ধন নেই কিন্তু পুত্র

দিয়ে লক্ষ্মী লাভের সৌভাগ্য যে সংসারে এত বিড়ম্বনা, তা কে জানত !

বিষ্টুপদ চলেছে হন্‌হন ক'রে। চলা না ব'লে তাকে ছোটা বলাই ভাল। লম্বায় প্রায় ছ' ফুটের উপর, গায়ের রং ক্ষয়-পাওয়া রোদে পোড়া ন্যাড়া গাছের মত। তেমনি শুকনো শক্ত হাড়কাঠ সার শরীর। খোঁচা খোঁচা গোঁ-মারা চুলগুলিকে তেল-জলের সার দিয়ে যেন পেড়ে ফেলার চেষ্টা হ'য়েছে। কিন্তু সে চুল ভাঙ্গে তো মচ্‌কায় না। মোটা ঠোঁট আর যাকে বলে অশ্বনাসিকা। গুলিভাটা গোল চোখ। আর খাকী ফুলশার্টের হাতে গলার বোতামটি পর্যন্ত আটকানো। দশ হাত কাপড় হাঁটুর বেশি নামেনি। তার তলা থেকে নেমে এসেছে আগুনে সেঁকা বাঁশের মত শিরবহুল সরু পা। পায়ে পরেছে পুরনো ফাটা টায়ার কাটা বে-সাইজের স্যাণ্ডেল।

এই হ'ল বিষ্টুপদর চেহারা। বংশমর্যাদায় কুলিন কায়েত। কোন্ অজানা যুগে নাকি বাপ-ঠাকুরদা প্রজা শাসনও করত। আর সে এখন কাজ করে মিউনিসিপ্যালিটীতে। ডেজিগনেশন লেখা আছে, কন্‌সারভেন্সি সুপারভাইজার, ১নং ওয়ার্ড। বিষ্টুপদ নিজে বলে, এ এস আই অর্থাৎ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। ডোম মেথর ধাঙ্গাড়ধাঙ্গড়িরা বলে, ছোট সোনাটরবাবু। মানে স্যানিটারিবাবু। পাড়ার ছোঁড়ারা আড়ালে বলে, শালা ধাওড়ার ভূত, ধাঙ্গড়-সর্দার।

সত্যি, চলেছে যেন তে-ঢিঙ্গে লম্বা একটা একরোখা ভূতের মত। সামনে পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, কোনদিকে হেলে না। মোটা ঠোঁট কুঁচকে রয়েছে অসহ্য তিক্ততায় ও যেন কিসের প্রতিজ্ঞায়। ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা আর কোঁচকান চোখ জোড়ার দূরে নিবদ্ধ অপলক চাউনিটা হ'য়ে উঠেছে শিকারসন্ধানী হন্যে শ্বাপদের মত।

ফাল্গুন মাস, আকাশ নির্মেঘ। হাওয়া পাগল। সকালবেলাটা যেন গোলাপী নেশার আমেজে ঢুলছে। রোদে তাত নেই। পাতা নেই গাছে গাছে। ধূলো উড়ছে, শুকনো পাতা উড়ছে, উড়ছে কাগজের টুকরো আর শুকনো রাবিশের ডাঁই।

মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের কম্পাউণ্ডে ঢুকতে না ঢুকতেই ফ্যালা ডোম হ্যা হ্যা ক'রে ক'রে হেসে তাকে অভ্যর্থনা করল, 'এই যে সোনাটরবাবু, এসে পড়েছ?'

বিষ্টুপদ থমকে দাঁড়াল। তার চোখ মুখ আরও বিকৃত হয়ে উঠল রাগে। ক্ষেপে উঠে ভেঙচি কেটে বলল, 'তা' পথের মাঝে কেন, অফিস থেকে ঘুরে এলে হ'ত না! কানা ডোম কোথাকার!' ব'লে সে যেন বাতাসে ধাক্কা মেরে চলে গেল অফিসে। ফ্যালা আবার হ্যা হ্যা ক'রে হেসে আপন মনে বলল, 'যাও, অর্ডারটা লিয়ে এস।'

সত্যি, ফ্যালা একে ডোম, তায় কানা। চেহারাটা এমনিতে মন্দ ছিল না। কালো মাংসালো মাঝারি শরীর, ঘাড়ের কাছে বেয়ে-পড়া ঝাঁকড়া চুল, গলায় কালো সুতোয় বাঁধা মাতুলি। কিন্তু এক চোখো। একটা চোখ তার ভাল, এমন কি টানা সুন্দরও বলা যায়। আর একটা চোখে মণি নেই। সাদা ক্ষেত্রটা সাদানীলে মেশানো ঘষা কাচের আবরণ ব'লে মনে হয়। হাসলে কিংবা রাগলে তার ভাল চোখটা বুজে যায়, আর কানা চোখটা বড় হ'য়ে ঠেলে ড্যালা পাকিয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে গজদাঁতগুলি বেরিয়ে প'ড়ে ভয়ঙ্কর হ'য়ে ওঠে তার মুখটা।

ফ্যালা বিষ্টুপদর সারাদিনের কাজের সঙ্গী হলেও সকালবেলা ওই এক চোখো ডোমের মুখ দেখতে সে রাজী নয়। কিন্তু কপাল গুণে দোষ। বোধ করি ফ্যালার মুখটা দেখার দোষেই অফিসে ঢুকতে না ঢুকতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ছেঁড়া শোলার টুপিটা মাথায় চাপিয়ে তাকে এক বিদ্‌ঘুটে নতুন হুকুম শুনিয়ে দিল। নতুন নয়, এর আগে অবশ্য আরও দু-চারবার তাকে এ কাজ করতে হয়েছে।

তাকে কুকুর মারতে যেতে হবে। কিন্তু লাঠি দিয়ে কুকুর মারা সাম্প্রতিক আইনে নিষিদ্ধ। তা'ছাড়া খাবারে বিষ দিয়ে মারলে হয়রানিও কম। ইন্সপেক্টর স্টিক্‌নিয়া বিষের শিশিটা আর ক'টা টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বেরিয়ে পড় বাবা বিষ্টুচাঁদ। তোমাদের এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাড়ি কাড়ি দরখাস্ত এসেছে। গাদা গাদা বাড়তি কুকুরে নাকি এলাকা ছেয়ে গেছে। তার উপরে একটা নাকি পাগলা খেপী, দু'জনকে কামড়েছে। টাকা দিয়ে মেঠাই মণ্ডা যা কিনবে, ভাল দেখে কিনো আর কুল্যে এক কুড়ি না হোক, ডজন খানেক সাবড়ে এস, বুঝলে ?'

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হ'য়ে রইল বিষ্টুপদ। এখন তার দাঁত চাপা মুখটা ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছে। তার চোখের সামনে ভাসছিল ফ্যালা ডোমের মুখটা। পরমুহূর্তেই সে মুখটা চাপা দিয়ে দেখা দিল শিবির টেপা হাসির সোহাগী মুখ। আসলে ওই অশুভক্ষণটি থেকেই আজকের এই অভিশপ্ত দিনটার শুরু।

ভেবেই গোঁ-ধরা ভূতের মত কাঁকড়ার দাঁড়ার মত শক্ত হাতে বিষের শিশিটা তুলে নিল। মনে মনে বলল, 'সেই ভাল, আজকের থেকে সকলের মুখে আমার বিষ দেওয়ার পালাই শুরু হোক।'

তারপর কি মনে ক'রে খ্যাপা শিম্পাঞ্জীর মত দাঁতগুলি বের ক'রে খ্যাঁক ক'রে উঠল, 'তা' এবার আমার ওই ডেকিজনেশন না ডেক্‌চিনেশনে সোপাইভাইজারটা কেটে ডোম ক'রেই দেওয়া হোক্।'

স্যানিটারি ইন্সপেক্টর হি-হি করে হেসে বলল, 'আরে ছ্যা, ডোম তো তোমার সাকরেদী করবে। তোমার পোস্টটা তা'হলে বিষ্টুচাঁদ ডগ্‌-কিলার করতে হয়।'

'ডগ্‌ কিলার ?'

'হ্যাঁ' ডগ্‌ মানে কুকুর, আর কিলার মানে খুনী।' ব'লে ময়লা হাফ-প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে আবার হি-হি ক'রে হেসে উঠল ইন্সপেক্টর।

নাকের পাটা ফুলিয়ে, চোখ ঘোঁচ ক'রে বিষ্টু বলল চাপা গলায়, 'তার চে' মানুষ-খুনী পোস্টই ভাল।'

জবাব দিতে গিয়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের জিভে কামড় প'ড়ে চোখ দুটো গোল হয়ে উঠল।

বিষ্টুপদ ততক্ষণে টাকা ক'টা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। পেছনে তার ফ্যালা ডোম।

খানিকটা গিয়ে ঘাড়ের থেকে লোহা-বাঁধানো লাঠিটা নামিয়ে বলল ফ্যালা, 'আচ্ছা সোনাটারবাবু, আগে তো শালা ডাণ্ডা ঠেঁকেই কাজ হ'ত, আজকাল এ নিয়ম কেন?'

'আইন নেই।'

কেশো গলায় খ্যাল্ খ্যাল্ ক'রে হেসে বলল ফ্যালা, 'শালা এ্যাইনটা বড় মজার। মারো, তবে পিটে লয়, বিষ দিয়ে।······অল শালা বেলাডি বোকাস্।'

ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে চোখের কোণ দিয়ে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বিষ্টু বলল, 'খচাসনি ফ্যালা, টুটি চেপে এই বিষ ঢেলে দেব গলায়।'

ফ্যালার কানা চোখের সাদা ড্যালাটা বেরিয়ে এসে তার চাপা হাসির মত কাঁপতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে তারা দুজনে যখন আধা সহর, আধা গ্রামাঞ্চলটার সীমানার নিরালা মাঠের ধারে, বাজ পড়া মাথা মুড়নো তাল গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল, তখন মনে হল যেন যমালয়ের দুটো গুপ্তচর নেমে এসেছে মারণ-যন্ত্র নিয়ে।

ইতিমধ্যে ফাল্গুনের রোদে একটু একটু তাত ফুটতে আরম্ভ করেছে। হাওয়াটা উদাস বৈরাগীর দীর্ঘশ্বাসের মত একটা চাপা হাহাকার তুলে দিয়ে যাচ্ছে মাঠের মাঝে। ফ্যালা ট্যাঁক থেকে একটা কলা পাতার পুরিয়া বের ক'রে ভেতর থেকে কালো মত একটা ছোট ড্যালা বাড়িয়ে দিল বিষ্টুর দিকে। জিনিষটা বাটা সিদ্ধি। বলল, 'ইচ্ছাপূরণের গুলিটা খেয়ে লাও সোনাটরবাবু। যেটাকে ধরবে আর প্রাণ নিয়ে সেটাকে ফিরতে হবে না।'

বস্তুটির দিকে এমনভাবে তাকাল বিষ্টু যেন এতেও তার মেজাজ খচে যাচ্ছে। দাঁত চেপে বলল, 'শালা মাতাল কোথাকার।' ব'লেই ছোঁ মেরে সিদ্ধিটুকু মুখে দিয়ে কোঁত্ ক'রে গিলে ফেলল।

ফ্যালাও একটা গুলি মুখে পুরে, ভাল চোখটা বুজিয়ে কানা চোখটা দিয়ে বিষ্টুর হাতের হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে বোগড়া দাঁত বের করে ফেলল। সুড়ুত্ ক'রে মুখের নালটা গিলে নিয়ে বলল, 'ওই বস্তু একখান বার কর সোনাটরবাবু। লইলে ইচ্ছা শালা আধ-খ্যাচড়া থাকবে।'

'মাইরী?' ব'লেই জ্বলন্ত চোখ দুটো ফিরিয়ে বিষ্টু সোজা হাঁটতে আরম্ভ করল। অনুপায় বুঝে পেছন ধরল ফ্যালা।

খানিকটা গিয়েই বিষ্টুর হাত চেপে ধরল ফ্যালা। দু'জনেই থম্‌কে দাঁড়াল। আঙ্গুল বাড়িয়ে হাত কুড়ি দূরে একটা কুকুর দেখাল। একেই বলে ডোমের চোখ। তাও কানা। যেন দুটো গুপ্তঘাতক শিকার পেয়েছে।

বিষ্টু দেখল, কুকুরটাও থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। সাদা কালো মেশানো বেশ বড়-সড় কিন্তু হাড় বেরকরা ক্ষীণজীবী জানোয়ারটার হলদে চোখের ভাবটা, এ লোক দুটোকে দেখে খ্যাঁক ক'রে উঠবে কি উঠবে না। বিষ্টুর নজরটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'মনে হচ্ছে দোআঁসলা মদ্দা। এক লম্বর ওয়ার্ডের মাল তো?'

ঠোঁট উল্টে বলল ফ্যালা, 'না-ই বা হ'ল। এলাকাটা তো তোমার?'

'যা বলেছিস্। তুই ব্যাটা ডাণ্ডা নিয়ে একটু তফাৎ যা।' ব'লে সে হাঁড়ির সাল পাতার ঢাকনা খুলে বের করল একটা রসগোল্লা। ছুরি দিয়ে রসগোল্লাটা একটু ফুটো ক'রে তারমধ্যে পুরে দিল এক টিপ্ বিষ। তারপর ফুটোটা বন্ধ ক'রে সে ফিরে তাকাল কুকুরটার দিকে। এবার তার গুলিভাটা চোখে খুনীর হিংস্রতা। যেন সে কারুর পেছন থেকে ছুরি মারতে উদ্যত হয়েছে।

কুকুরটা চাপা গলায় গর্জাচ্ছে। অর্থাৎ এদের মতলবটা কি। কিন্তু সেই সঙ্গেই ল্যাজ নেড়ে, জিভ দিয়ে গাল চেটে লুব্ধ চোখে দেখছে রসগোল্লাটা।

বিষ্টু জিভ দিয়ে তু তু করতেই কুকুরটা কয়েক পা পেছিয়ে ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠল। কিন্তু পালাল না। বিষ্টু এবার কয়েক পা এগিয়ে গেল। কুকুরটাও পেছুল। কিন্তু লোভ আর সন্দেহের দো-টানায় পড়ে কুকুরটা ল্যাজ নেড়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করছে।

বিষ্টু হঠাৎ দাঁড়িয়ে, একটি পরিষ্কার জায়গায় রসগোল্লাটি রেখে সটান পেছন ফিরে একেবারে সেই ন্যাড়া তালগাছটার তলায় ফ্যালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কুকুরটা কয়েক মুহূর্ত থম্‌কে রইল। তারপর আড়চোখে তাকিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল রসগোল্লাটার কাছে।

উত্তেজনায় বিষ্টুর দাঁতগুলি চেপে বসেছে ঠোঁটের উপর। চাপা গলায় বলল, 'খা খা শালা। ফ্যালার সাদা চোখটা বড় হ'য়ে হা করা মুখের কষ দিয়ে লালা গড়িয়ে এল খানিকটা আর নিসপিস্ ক'রে উঠল লাঠিধরা হাতটা।

কুকুরটা আর একবার তাদের দিকে দেখেই কপ্‌ ক'রে রসগোল্লাটা মুখে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে খানিকটা ছুটে গেল। কিন্তু লোক দুটোকে না আসতে দেখে দাঁড়িয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে গেল। খেয়ে মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

'খেয়েছে শালা, খেয়েছে।' সাফল্যের উল্লাসে বিষ্টুর বেজীর মত চোখ দুটো যেন আরও জ্বলে উঠল। বলল, 'চ দেখি টেস্ ক'রে, ম'ল কিনা!'

ফ্যালারও গজ দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়েছে খ্যাপা কুকুরের মত। বলল, 'মরবে না আবার! তবে এক্টা রসগোল্লা খেয়ে ম'ল মাইরি!'

বলে সে লালার দড়ানি জিভ্‌ দিয়ে চেটে নিল। তারপর দু'জনেই মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

কুকুরটা ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়েছিল একটা আসশেওড়া ঝোপের তলায়, লোক দেখেই ছুটে পালাল। কিন্তু বেশী দূর যেতে পারল না। খানিকটা গিয়েই টলতে লাগল আফিম্‌খেগো আড়-মাত্‌লার মত।

তীর বিদ্ধ শিকারের পেছনে পেছনে ক্ষিপ্ত ব্যাধের মত ফ্যালা আর বিষ্টু ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল পাড়ায়।

কুকুরটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে ঝিম্‌ ধরা মাতালের মত। চোখ দুটো আধবোজা রক্তবর্ণ। ঘং ঘং ক'রে কাশছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে বুকের পাঁজরা। ঠিক যেন একটা মুমূর্ষু বুড়ো। উগরে ফেলতে চাইছে পেটের বিষ।

বিষ্টু এক নজরে মুখ বিকৃত ক'রে এ মরণলীলা দেখছিল। ফ্যালা হঠাৎ খ্যাল্‌খ্যাল্‌ ক'রে হেসে তেঁড়ে গলায় চীৎকার ক'রে গান ধরে দিল।

'ও তোর ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল
যম দাদাকে যেয়ে ব'লো,
খেয়েছি মণ্ডা মেঠাই,
সোনাটর বাবুর হাতে।'

আবার হাসতে গিয়ে থেমে বলল, 'সোনাটরবাবু, ঠাউরের নাম লেও।'

'কেন?'

'এট্টা পাণী হত্যে ক'রলে, পাপ লাবাতে হবে না?'

পাপ? বিষ্টুর প্রাণের কোথায় চাপা পড়া আগুন যেন উস্‌কে উঠল পাপ কথাটায়। তীব্র চাপা গলায় বলল, দাঁড়া! ঘর বার সব সাবড়াই প্রাণ খুলে, তারপর দেখা যাবে তোর ঠাকুরের নাম।'

ব'লে সে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থম্‌কে দাঁড়াল।...কুকুরটা সামনের দিকে বাড়ানো পায়ের মাঝখানে হাঁটুতে মাথা গোঁজার মত এলিয়ে পড়েছে, আর ঠেলে বেরিয়ে

আসা নিষ্পলক চোখ দুটো দিয়ে যেন তাকিয়ে আছে বিষ্টুর দিকে। মরে গেছে কুকুরটা।

বিষ্টু মুখটা ফিরিয়ে এগুতে এগুতে বলল, 'ফ্যালা বিকেলে গাড়ি করে ভাগাড়ে নিয়ে ফেলে দিস! তারপর হঠাৎ নাকটা কুঁচকে বলল, 'অল শালা ব্লাডি বোগাস।'

তারপর চলল সারা এলাকা জুড়ে কুকুর মারার পালা। কখনো গঙ্গার ধার থেকে পুবের রেল লাইন পর্যন্ত, কখনো লাইনেব উপর উত্তর দক্ষিণের এক নং ওয়ার্ডের দুই সীমানা পর্যন্ত।

কি রকম একটা নেশায় পেয়ে বসেছে বিষ্টুপদকে। ক্ষিপ্ত হিংস্র, একরোখা। যেন কোন খুনী হত্যালীলায় মেতেছে।

ফ্যালার হাতের লাঠি ঠাণ্ডা তো ফ্যালাও ঠাণ্ডা। তার কোন উত্তেজনা নেই। সে খালি লুব্ধ কুকুরগুলির মতই জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে বিষ্টুর হাতের হাঁড়িটা আর জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে।

কিন্তু সোনাটরবাবুর খ্যাপামি দেখে চাইতে ভরসা পাচ্ছে না। যা হয়, ওই দেখে দেখেই। আশা আছে শেষের বেলায়। বোধ হয় শেষের বেলার কথা ভেবেই কানা চোখটা নাচিয়ে নাচিয়ে হাতের লাঠিতে তাল ঠুকে গুণগুণ করছে সে।

কিন্তু বিষ্টুর নজর শুধু একদিকে, কুকুর। যেমনি দেখা, অমনি রসগোল্লা, ছুরি আর বিষ। তারপব, 'খা, খা শালা জন্মের মত।' বলে আর জিজ্ঞেস করে, 'ক' নম্বর হল ফ্যালা?'

ফ্যালা বলে, 'আধ ডজন নম্বর দাঁড়াল।'

পেছনে পেছনে ভিড় করে পাড়ার বাচ্চা ছেলের দল। বিষ্টু খেঁকোয়, 'দোব রসগোল্লা?' ফ্যালা তাড়া দেয় বাচ্চাগুলোকে।

কেউ বলল, 'অমুক কুকুরটা মেরে দিও তো। রোজ শালা রাত ডিউটি থেকে ফেরবার পথে কামড়াতে আসে।'

কেউ বা বলল আবার, 'অমুক কুকুরটা মেরো না হে বিষ্টপদ। ওটা সারারাত খেঁকোয়, আমি তাই জেগে থাকি। যা চোর ডাকাতের ভয় বাবা।'

বিষ্টু ওসব কমই শোনে। যেটাই সামনে পড়ুক, গলায় দড়ি, বেল্ট বাঁধা না থাকলেই হল। কিন্তু সেই খেপী কুকুরটা কোথায় গেল? থেঁকি খেপীটা?

যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় বিষ্টু। বলে, 'ফ্যালা ওই যে একটা শুয়ে আছে।'

ফ্যালা কানা চোখ বড় করে হেসে বলে, 'ওটা শোয়া নয়, মরা।'

'মরা? কে মারল?'

'কেন, তুমি সোনাটরবাবু।'

তা বটে। খেয়াল নেই বিষ্টুর। প্রায় সব পাড়াতেই গাদা গাদা কুকুর দেখে তার মাথাটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করে, 'ফ্যালা, এত কুকুর এল কোত্থেকে?'

ফ্যালা বলে, 'কেন, ভাদ্দর মাস গেছে, পোষ মাঘ গেছে, হারামজাদীরা বিইয়েছে কাড়ি কাড়ি।'

বিষ্টু খানিকক্ষণ চুপ করে মাথা নেড়ে বলে 'হুঁ'! কি খেয়ে বাঁচে এগুলো?'

'কি আবার, পচা পাত্‌কুড় বিষ্টা।'

খ্যাক খ্যাক শব্দ করে বোধ হয় বিষ্টু হেসেই ফেলে। বলে, 'ঠিক মানুষের বাচ্চার মত, না?' বলেই বিকৃত মুখটা ফিরিয়ে আবার হন্‌হন্ করে এগোয়। আবার চলতে থাকে কুকুর নিধন অভিযান। আর ফ্যালা আবার বাড়িয়ে দেয় ইচ্ছাপূরণের গুলী। শুধু তার ইচ্ছা পূরণ হয় না।

ফাল্গুনের হাওয়া থেকে থেকে অনাগত চৈত্রের ঘূর্ণিতে মেতে উঠছে। বেলা বাড়ছে চড়চড় করে। নীল আকাশটা ধুলোয় ধুলোয় ফ্যালা ডোমের ঘষা চোখটার মত রং ধরেছে। হঠাৎ ফ্যালা বলে, 'আচ্ছা সোনাটরবাবু মানুষও কি শালা বাড়তি হয়ে গেছে?'

বিষ্টু বলে, 'নইলে এত মরে? খাবে কি! খায় তো সব পচা বিষ।'

ফ্যালা ভাল চোখটা বুজিয়ে বলে, 'তা'লে মানুষের মাথার 'পরেও শালা সোনাটরবাবু আছে বল! সে ব্যাটা কে?'

হঠাৎ বিষ্টুর অপ্রতিভ মুখে কোন কথা যোগায় না। তারা দুজনেই তিনটে নেশাচ্ছন্ন চোখে পরস্পরের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। দু'জনেই তারা কি এক ভাবনায় যেন তলিয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। বোধ হয়, সত্যিই ভাববার চেষ্টা কবে, মানুষের বিষবাহী সেই জীবটা কে।

পর মুহূর্তেই বউ শিবির সকালবেলার মুখটা মনে হতেই সে রেগে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ছাখ কানা ডোম, কাজের সময় বকিস্‌নি। নিকুচি করেছে তোর মানষের সোনাটারের। শালা মরুক সব। হেজে যাক, সেই ভাল। এবার হিসেব দে, কটা মরেছে।'

ফ্যালা ভাবে, কুকুর মাবার মত মানুষের সোনাটরবাবুও বোধহয় এরকমই ভাবে। বলে, 'তা কুল্যে আটটা হল।'

'মাত্তর!'

আবার শুরু। আবার সন্ধান। বিষেব শিশি যেমন তেমনই তো আছে। খরচ কোথায়? সেই খেপীটা কোথায়, যেটা কামড়ায়? ঘোর দুপুর নিঝুম। ফাঁকা পথ, লোকজন নেই। ঘরে ঘরে দরজা জানালা সব বন্ধ। এখানে ওখানে মরা কুকুর। চারদিকে মাছির উল্লাস। হয়তো আকাশে উড়ে চলেছে শকুনকে সংবাদ দিতে। আর ভ্যানভ্যান করে উড়ে চলেছে বিষ্টুর সঙ্গে হাঁড়ির গায়ে গায়ে।

আর এ বসন্ত দুপুরে, বিষ্টু ও ফ্যালাকে মনে হয়, সত্যিই বুঝি দুটো হন্যে হওয়া যমেরই অনুচর।

হঠাৎ দূর থেকে একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'হেই ফ্যালা, শীগগির আয়, এখেনে রয়েছে সেই খেপীটা।' দু জনেই তারা সেদিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েই পালাল।

দেখা গেল, অদূরেই নর্দমাতে মুখ নীচু করে কি যেন খাচ্ছে একটা কুকুর। রোগা, লম্বা, ছাই রং-এর মাদী কুকুর। সমস্ত শরীরের ভারটা নীচের দিকে ছ'টা পুষ্ট স্তনের ভারে ঝুলে পড়েছে। নিটোল মেটে বর্ণের চোষা স্তন।

দেখেই বিষ্টুপদর চোখেব দৃষ্টি যেন জ্বলে উঠল। বলল, 'ফ্যালা, হারামজাদী বিইয়েছে।'

ফ্যালা বলল, 'ওই জন্যই বোধ হয় খেঁকি হয়েছে। দেখ না, মেয়েমানুষে বিয়োলে খেঁকি হয়?'

'হুঁ। এটাকে মারলে একটা বিউনী কমবে। ওকে শালা আমি জোড়া রসগোল্লা খাওয়াব।' বলে সে দুটো রসগোল্লা বের করে কেটে বিষ পুরে দিল।

কুকুরটা হঠাৎ নর্দমা থেকে মাথা তুলল। এদের দেখে আরও খানিকটা গলাটা টান কবে ঘাড় বাঁকিয়ে বিষ্টুর হাতের বস্তুটির দিকে তাকাল। হলদে মণি আর লাল চোখে সামান্য একটু কৌতূহল ফুটল। কিন্তু একটা শাণিত খ্যাপামি ও সন্দেহে চক্‌চক্ করছে চোখ দুটো।

বিষ্টু রসগোল্লা দুটো নামিয়ে ফ্যালাকে নিয়ে সরে গেল দূরে।

কুকুরটা রসগোল্লা দুটোর কাছে এসে এক মুহূর্ত মাথা নীচু করে দাঁড়াল। আবার মুখ তুলে একবার বিষ্টুকে দেখে, হঠাৎ পেছন ফিবে দুধের বাঁট দুলিয়ে দুলিয়ে চলে গেল।

বিষ্টু আর ফ্যালা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে এগিয়ে এসে দেখল, কুকুর খাবার ছোঁয়নি পর্যন্ত। আশ্চর্য! আশাতীত।

রাগে বিস্ময়ে বিষ্টু জ্বলন্ত চোখে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওরে শালা, হারামজাদী যে মানুষের বাড়া দেখছি।'

ফ্যালা বলল, 'সেয়ানা হয়ে গেছে। হবে না, ওযে মাদী। পেটের বাচ্ছা পালতে হবে যে!'

দৃঢ় চাপা ক্রুদ্ধ গলায় গর্জে উঠল বিষ্টু, 'পালাচ্ছি বাচ্চা। যাওয়াচ্ছি ওর মাই ছুলিয়ে ছুলিয়ে।'

খপ্ করে সে রসগোল্লা ছুটো তুলে নিয়ে পলকে দেখে নিল, বাঁ দিকের গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল কুকুরটা। বলল, 'চ' ফ্যালা, বিষ না হয়, তোর ডাণ্ডা দিয়েই ওকে সাবাড় করতে হবে।'

ফ্যালার ওতে কিছু যায় আসে না। বলল, 'চল। কিন্তু, ছুটো মিষ্টি নষ্ট করলে তো সোনাটরবাবু।'

বিষ্টু খেঁকিয়ে উঠল, 'তবে কি তোকে দেব?'

ফ্যালা কানা চোখের ড্যালা কাঁপিয়ে হেসে বলল, 'আমাকে না হয়, আমার ডোমনিটাকে তো দিতে পারতে?' বলে হ্যা হ্যা করে হাসে। 'জানলে বাবু বউটা ওই হাঁড়ির জিলিসটা এখন খালি খেতে চায়। মানে, পোয়াতি কি না।'

বিষ্টুর গায়ে যেন আগুন লাগে কথাটা শুনে। বলে, 'ও, তাই সক্কাল থেকে মিষ্টি দেখে তোমাব এত ফুর্তি! বলি, ক'বিউনী হল তোর বউ।'

'তা' তোমার এবার লিয়ে পাঁচবার।'

মনে হল বিষ্টু এবার ঘুষি কসাবে ফ্যালার ওই চোখটাতে। ভেংচে বলে, 'আরও চাই?'

ফ্যালার হাসিটা অদৃশ্য হয়ে যায়। ভাল আর কানা ছুটো চোখই মেলে ধরে চাপা গলায় বলল, 'তবে আর তোমাকে বলছি কি। পাইখানা-ঘাঁটা ধাওড়ার মায়ের পেটের ছেলে যে বাঁচে না। এও জান না। চারটে তো শালা মরেই গেছে।'

বিষ্টু তেমনি ভেংচে খেঁকিয়েই বলে, 'তবে বিষ পুরে দোব'খনি, সবশুদ্ধ গায়েব হয়ে যাবে।'

কিন্তু ফ্যালা ডোমের প্রাণ তাতে বাগ মানে না। ওই ভর ছুপুরে বেস্থরো গলায় গেয়ে ওঠে,

'ভালবেসেছিলুম বলে
মালাটি দিলে গলে
সোহাগ করে কোলে দিলে
নাদাপেটা ছে—লে !'

বিষ্টু আচমকা মুখ চেপে ধরে ফ্যালার। বলে, 'থাম্ শালা, ওই ছ্যাখ।'

দেখা গেল সেই মাদী কুকুরটা একটা ঝোপের আড়াল থেকে ঠিক মানুষের মত উঁকি মেরে তাদের দেখছে।

দু'জনেই একটু দাঁড়াল। ফ্যালা বলল, 'সরে এস, পেছু দিয়ে যাব।'

বলে তারা পেছনে ফিরে একটা বাগানের ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে এগুল। এদিকটা এলাকাব শেষ, তাই জায়গাটা গাছে, জঙ্গলে, বাঁশঝাড়ে ছাওয়া গ্রাম্য নিঝুমতায় আচ্ছন্ন।

বাগানের পেছন দিয়ে, খুব ধীরে সেই ঝোপটার কাছে এসেই তাবা হতাশ ভরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নেই কুকুরটা। কোথায় গেল ?

হঠাৎ খড়খড় শব্দে চমকে ফিরে দেখল, বাগানের মাঝখান দিয়ে কুকুরটা ছুটছে। তারাও দুজনে ছুটল। কিন্তু খানিকটা ছুটেই তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কুকুরটা। নিঃশব্দ। দুজনেই কয়েক মুহূর্ত কান পেতে রইল। শুধুই হাওয়ার সড়সড়, পাতার মড়মড়। দুজনেই থেমে গেছে।

বিষ্টুর চোখ দুটো আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। সেই ছোঁয়াটা লেগেছে এবার ফ্যালারও। ঠেলে উঠেছে তার কানা চোখটা। বলল, 'হারামজাদী আমাদের চেয়েও সেয়ানা। চল দেখি ওই বাঁশঝাড়ের দিকে।'

দু'জনেই পা টিপেটিপে বাঁশ বাগানের মাঝখান দিয়ে চলল। খানিকটা গিয়েই বিষ্টু ফ্যালার হাত ধরে দাঁড়াল। বলল, 'মনে হচ্ছে, আমাদের ডানদিকের বাঁশঝাড়টা দিয়ে কে যেন যাচ্ছে।'

দু'জনেই কান পাতল।· না, কোন শব্দ নেই।

কিন্তু আবার তারা পা বাড়াতেই প্রতিধ্বনির মত ডান দিক থেকে শব্দ শোনা গেল। তারা থামলেই ওই শব্দটাও থেমে পড়ে। তারা তিন চোখে বোকার মত পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে। ভুত নাকি? তবে তারা দুজনে কি?

বাঁশ বাগানটা শেষ হওয়ার মুহূর্তেই তাদের চমকে হতাশ ক'রে দেখা গেল কুকুরটা তাদের চোখের সামনে দিয়ে সড়সড় ক'রে মাঠের দিকে ছুটল। তার ছোটার দোলায় যেন ছিটকে পড়ার উপক্রম করল পেটের তলার স্তনগুলি।

এবার দু'জনেরই রোখ্ চেপে গেল। দু'জনেই ছুটল মাঠের দিকে মাথা নীচু করে। দেখল, মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে কুকুরটা। ছুটে একেবারে পূবের সড়কটার উপর দিয়ে ফিবে দাঁড়াল। কিন্তু এবা দু'জনেই মাথা নীচু করে রইল।

তবু কুকুবটা উত্তর দিকে ছুটে হঠাৎ রাস্তাব নাবিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সূর্য ঢলে পড়েছে। দুপুর শেষ হ'তে চলেছে। এই নিঝুমতার সুযোগে হাওয়া যেন আরও দুর্বার হয়ে উঠছে।

হাঁপাচ্ছে বিষ্টু আর ফ্যালা ডোম। ফ্যালা বলল, 'আজ ছেড়েই দেও, কাল হবে।'

বিষ্টু খ্যাপার মত উঠে দাঁড়ালো—'না, আজই ওকে নিকেশ করব, চ' পা চালিয়ে।' তারা যখন ছুটতে ছুটতে সড়কে এল, তখন দেখা গেল কুকুরটা রেল লাইন দিয়ে ছুটছে। আরও উত্তর দিকে খানিকটা ছুটে পূবের নাবিতে আবার অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

বিষ্টু হতাশ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'যাঃ 'ইউনিয়নবোর্ডের এলাকায় চলে গেল?'

দু'জনেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেই মাথা ন্যাড়া তালগাছটার তলায়। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে চলল আবার মাঠ ভেঙ্গে। বিষ্টুর চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে শিকার

ফস্‌কানো নিষ্ফল আক্রোশে। ফ্যালার ভাল চোখটা বন্ধ থাকায় ভাবটা তার ঠিক ঠাওর করা গেল না।

ক্লান্ত পায়ে মাঠ পেরিয়ে বাগান পেরিয়ে ঠাকুরপাড়া ঘুরে মুচিপাড়ার ঝোপে ছাওয়া সরু গলি দিয়ে তারা এগিয়ে চলল।

মুচিপাড়ার শেষ সীমানায় বিষ্টু আবার থমকে দাঁড়াল। দেখল এর মধ্যেই ফিরে এসেছে সেই মাদী কুকুরটা। শুয়ে পড়েছে একটা মানকচু গাছের পাতার ছায়ায়। মেলে দিয়েছে ঠ্যাং, ছড়িয়ে দিয়েছে বুক, পেট। আর তার পুষ্ট স্তনগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কতগুলো নধর তুলতুলে ছোট ছোট বাচ্চা। চক্‌চক্‌ শব্দে মাই খাচ্ছে, আর আরামে কুঁই কুঁই করছে।

ফ্যালা দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে ডাণ্ডাটা তুলতেই বিষ্টু চেপে ধরল তার হাতটা। ফ্যালা অবাক হয়ে লাঠিটা নামিয়ে নিল।

ক্লান্ত কুকুরটা টেরও পেল না তার দুশমনেরা এসে দাঁড়িয়েছে। দুধের ভারে তার টনটনে স্তন হালকা হ'য়ে যাচ্ছে, বাচ্চাঠাসা বুকে আরামে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাওয়া বইছে আর কোথা থেকে একটা বসন্ত পাখী উল্লাসভরে ডাকছে।

বিষ্টুপদর ক্লান্ত ঘর্মাক্ত বিকৃত মুখটার সমস্ত আঁকাবাঁকা রেখাগুলো যাদুবলে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। চোখের ক্ষিপ্ততা কেটে গিয়ে একটা চাপা বেদনায় ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে উঠল দৃষ্টিটা। বারবার তার চোখের সামনে ভাসছে এমনি একটা ছবি। এমনি, তবে সেটা গাছতলা নয়, ঘরের নিরালা কোলে একটা মানুষীর, দুপুরে অথবা মধ্য রাত্রে শুয়ে থাকার ছবি। এমনি, কিন্তু বাচ্চাগুলো মানুষের। এমনি, কিন্তু সে তার শিবি, খেপী নয়, তবু খেপী।

যেন ঘুম না ভাঙ্গে, এমনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল বিষ্টু, 'শুধু এই জন্যে, জানিস, হারামজাদী ছুটছিল। ছেড়ে দে এবারের মত।'

ব'লে সে খানিকটা গিয়ে আবার দাঁড়াল। আবার মুখটা বিকৃত ক'রে, চোখ কুঁচকে পকেট হাতাতে হাতাতে বিড়্‌বিড়্ ক'রে বলল, 'অল্‌শালা ব্লাডি বোগাস। ফ্যালা।'

ফ্যালা ভাবছিল শালা পাগলা সোনাটরবাবু। বলল, 'বল।'

'চারটে পয়সা দিবি?'

ফ্যালা ট্যাক হাতড়ে একটা আনি দিয়ে বলল, 'কেন, ওই হারামজাদীকে দেবে নাকি?'

ব'লে খ্যাল খ্যাল ক'রে হেসে ফেলল। বিষ্টু তখন ভাবছে, এতক্ষণে বোধ হয় মিঠুব লঙ্কার আচারের দোকানটা বন্ধ হ'য়ে গেছে। আনিটা নিয়ে রসগোল্লার হাড়িটা হাতে দিয়ে বলল, 'যাঃ শালা, নিয়ে যা।'

বলে উল্টো দিকে ফিরে হন্‌হন্ ক'বে এগিয়ে গেল। তে-ঢিঙ্গে লম্বা, ভূতের মত ঠ্যাং ফেলে ফেলে চলেছে যেন সেই মাথা মুড়নো তালগাছটা।

ফ্যালা একবাব হাঁড়ি আর একবার সোনাটরবাবুর দিকে ভাল চোখটা মেলে দেখল। তারপর কানা চোখটা তুলে ভাল চোখটা বুজিয়ে বলল, 'অল্ শালা বেলাডি বোকাস।'

বলে হাঁড়ি নিয়ে ডাণ্ডা কাঁধে ফেলে ধাওড়ার দিকে ছুটল।

শুভ বিবাহ

শুভবিবাহ কথাটি খুবই চলিত। আমি যে বিয়ের কথা বলতে যাচ্ছি, সেটা ঠিক আপনাদের মতে শুভবিবাহ নাও হতে পারে। মনে হতে পারে খানিকটা অভিনব। অভিনব বিয়ে।

বেশ কিছুদিন আগের কথা বল্‌ছি। একটি ছোটখাটো বেকারী ফ্যাক্টরীর হিসাব রক্ষকের কাজ করতুম। আসলে, হিসাব রক্ষা, মালখানা পাহারা দেওয়া এবং সাপ্লায়ার—এই ত্রিবিধ কাজই আমাকে করতে হত। মাইনে পেতুম গোটা তিরিশ। আমার মালিকের এক শালা ছিল, কলকাতা থেকে প্রায় ষাট বাষট্টি মাইল দূরে, ছোট মফঃস্বল টাউনে। মনোহারী দোকান ছিল তার। আমাকে মাঝে মাঝে মাল নিয়ে, সেইখানে পৌঁছে দিয়ে আসতে হত। সেই সময়টাতে ময়দা পুরো র‍্যাশনিং। পারমিট ছাড়া এক চিমটি ময়দাও পাওয়া যায় না। সেই জন্য, আমার মালিক দূরে মালটা পাঠিয়ে বেশ ভাল রোজগার করছিল।

কিন্তু কাজটা বড় বিশ্রী। অবশ্য মালটা বহন করবার জন্য আমায় কুলীর পয়সা দেওয়া হত। তবু, এত দূরে গিয়ে, মালটা দিয়ে আসতে হত যে, আমার ধৈর্য থাকত না এক একদিন। দায়িত্বও ছিল কম নয়। মালের দায়িত্ব, তা ছাড়া পাই পয়সাটি পর্যন্ত গুণে গুণে হিসাব দেওয়ার দায়িত্ব, সবই করতে হত। তারপর, মালিকের শালাটি পয়সার ব্যাপারে—

যাক্‌গে ওসব কথা। সেখানে যাওয়ার সারাদিনে তিনটি গাড়ি আছে। তার মধ্যে একটি আমাদের শহরতলীর স্টেশনে দাঁড়ায় না। সকালের গাড়িটি ফেল করলে, রাত্রি সাড়ে সাতটায় আর একটি। সেইটিতে গেলে, মালিকের শালাকে ঘুম থেকে তুলতে হয়। অবশ্য শ্যালক যদি ঘরে থাকে। তার বসতবাড়ি আবার সে শহর থেকে

মাইল তিনেক দূরে। কোন কোন দিন সে সেখানে যায়। কোনদিন বা সেই শহরেরই মেয়েমানুষের পাড়ায়—

যাক সে কথা। আমাকে নানান রকম ভোগান্তি পোয়াতে হয় প্রায়ই। তবে মাগ্‌না নয়, তিরিশটি টাকার বিনিময়ে। আর খুব খিদে পেলে, রুচি থাকলে, কারখানার ছাড়্ অর্থাৎ খারাপ কিংবা ভাঙ্গাচোরা রুটি বিস্কুট খেতে পাওয়া যেত। এইটি বিনা পয়সায় পাওয়া যেত। একমাত্র উপুরি রোজগার।

একবার আমাকে যেতে হল সেই সাড়ে সাতটার গাড়িতে। সেদিন আকাশের অবস্থাটা ভাল নয়। শ্রাবণ মাস। জলটা ঠিক জোরে হচ্ছে না। হাওয়াও নেই। সারাটি দিন দিনের মুখ ভার হয়েছিল মেঘ অন্ধকারে। বৃষ্টি হচ্ছে ফিস্‌ফিস্ করে। যেমন রাস্তার অবস্থা, তেমনি গাড়ীগুলির তৃতীয় শ্রেণীর অবস্থা। তার উপর ছিল সে দিন বিয়ের লগনসা—বর আর বরযাত্রীরও ভিড় ছিল। বাজার গাড়ীগুলির তো কথাই নেই। হয় আঁশটে, নয় ছানার বোটকা গন্ধে ভরা। তার উপরে অন্ধকার। যেন ওই গাড়িগুলিতে বাতি জ্বলতে নেই। ভাল কামরাতেই জ্বলে না। আমার সঙ্গে ছ'টিন মাল। এস, পাপা, লেড়ো, নানান্ রকমেব দেশী বিস্কুট, রুটি, কেক্‌ভরা। আমাকে বাজার গাড়িতে উঠতে হলো। থার্ডক্লাসের যাত্রীরা এত মাল নিয়ে উঠতেও দিতে চান না।

বেরুলাম, সেখানে পৌঁছলুম প্রায় রাত্রি এগারটার সময়। সেই একই ফিস্‌ফিসে জল, আর গুমোট। মাঝে মাঝে চোখ ঝলসে দিচ্ছে বিদ্যুৎ। সারা স্টেশনে কুলী নেই একটিও। মালটা নামালুম নিজের হাতেই। মাগনা নয়। কুলীর পয়সাটা লাভ হল নিজের।

স্টেশনটা নদীর পারে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হয় অনেকখানি। নামি কি করে এত মাল নিয়ে। নীচে উঁকি দিয়ে দেখলুম, রিকশাওয়ালা নেই একটিও। টিকেট কলেকটর চিনতেন আমাকে। মালগুলি রাত্রের মত অফিসে রাখতে দিলেন। টিনগুলি অবশ্য তালাবন্ধ ছিল :

বসে বসে কি করি। নীচে নেমে গেলুম, যদি কোন দোকানে একটু চা পাওয়া যায়। টিকেটকলেক্টর বললেন, 'কি, শহরে রাতটা কাটিয়ে আসা হবে বুঝি?'

বলার ভঙ্গিটি খুব স্পষ্ট। বললুম, 'দেখি কি হয়।'

উনি হাসলেন। আমি নেমে এলুম। ইস! কী বিদ্যুৎ! যেন নির্ঘাৎ বাজ পড়বে মাথায়।

স্টেশনটা অনেক উঁচুতে। নীচের জমির সঙ্গে গিয়ে মিশেছে প্রায় এক মাইল দূরে। স্টেশনের লাইনের তলা ইট সিমেণ্ট দিয়ে জমানো। যেন উপরে ব্রীজ আর নীচে রাস্তা। কিন্তু রাস্তা ঠিক নয়। তলা দিয়ে সরু সরু মালা ঢাকা গলির মত হয়েছে এক একটি খিলানের তলায়। চামচিকের বাস। ইঁদুর, আরশোলা, সাপ-খোপ, সবকিছুরই যাতায়াত আছে এই সুড়ঙ্গগুলিতে।

নীচে নেমে দেখি, চায়ের দোকান খোলা নেই। শহরটা গুটিসুটি হয়ে ঘুমোচ্ছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে, খানিকটা উত্তরদিকে একটু আলোর আভাস চোখে পড়ল। এগিয়ে গেলুম।

দেখলুম আলো জ্বলছে স্টেশনের নীচের একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে। তারমধ্যে কিছু লোক! তা' বেশ কিছু, প্রায় জনা চোদ্দ পনর হবে। গোটা দুয়েক সাইকেল রিকশাও ঢোকানো রয়েছে।

আমাকে দেখে সবাই তাকাল। আলো বলতে সাইকেল রিকশার দুটি আলো। বসানো হয়েছে খিলেনের দেয়ালে ছোট ছোট খুপরীর মধ্যে। একটি চামচিকে নরকে আবদ্ধ আত্মার মত এপাশে ওপাশে ছট্‌ফট্ করে উড়ছে। আর মানুষগুলিকে ঠিক মানুষ মনে হচ্ছিল না। যেন কতগুলি কিম্ভুতকিমাকার মূর্তি এক ভিন্ন ভয়াল অন্ধকার রাজ্যের কোণে বসে কিসের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত ছিল, একটি নতুন জীব দেখে চমকে উঠেছে। মুখগুলি যেন অদ্ভুত রং মাখা, বাঁকা চোরা ভাঙ্গা, নাকমুখহীন দলা দলা। শরীরগুলিও সেই রকম। নিজেদের ছায়ার সঙ্গে মিলেমিশে আর একটি প্রাকৃতিক রূপ যেন।

এক মুহূর্ত পরেই নজর করে দেখলুম, সবাই ঘিরে বসেছে দুজনকে মাঝখানে রেখে। একজন পুরুষ, আর একজন মেয়েমানুষ। একমাত্র তাদের দুজনেরই নতুন কাপড়।

পুরুষটি কালো, রোগা। খোঁচা খোঁচা চুল, খালি গা। বয়স অনুমান করা যায় না। মেয়েমানুষটির ঘোমটা আছে, তবু মুখ দেখা যায়। সেও কালো, চুলগুলি জটপাকানো। চোখগুলি কোটরে ঢুকে গেছে, দৃষ্টি একটু রোখা রোখা। গায়ে জামা নেই। শরীরের পুষ্টতা চোখে পড়ে। তবে বয়স বলা কঠিন।

আমার মনে হল, এদের অনেককেই আমি চিনি। কিন্তু কোথায় দেখেছি, মনে করতে পারছিনে। আশ্চর্য! তা'হলে কি জন্মান্তর বলে কিছু আছে নাকি? এরা কি আমার গত জন্মের চেনাশোনা, নাকি আগের মৃত্যুর পর পৃথিবীর কোন এক অদৃশ্য লোকে এদের দেখেছিলুম।

হঠাৎ একজন বলল আমাকে, 'কে? কি চাই?' যে বলল, সে একজন আধবুড়ো। তাকেও আমি যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে। বললুম, 'কিছু চাইনে। একটু চায়ের দোকানের খোঁজে এসছিলুম।'

একটি বুড়ির খন্‌খনে গলা শোনা গেল, 'চা তো এখেনে পাবেন না গো বাবুমশাই। এখেনে একটা শুভ কাজ হচ্ছে এখন।'

বলেই বুড়ি হেসে উঠল কেশো গলায়। আরে, বুড়িটা তো চেনা। ও হো! হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। এই বুড়িটা তো, এই স্টেশনেরই সিঁড়িতে ভিক্ষে করে।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'নিবাস কোথায়? কোথায় যাওয়া হবে?' যে জিজ্ঞেস করল, তাকেও এবার চিনতে পারলুম। সে এখানকার একজন রিক্‌শাওয়ালা। অনেকবার আমার মাল বয়েছে। বললুম' 'যাবো তো শ্রীহরির মনোহারী ষ্টোর্সে। কিন্তু রাত হয়ে গেছে—'

রিক্‌শাওয়ালা অমনি বলে উঠল, 'ও হো! আপনি? সেই রুটি বিস্কুটওয়ালা বাবু তো! সাঁতরা বাবুর দোকানে তো অনেকবার আপনাকে নিয়ে গেছি। তা এত রাতে আর কোথায় যাবেন রুটিওয়ালা বাবু, বসে যান না এখানেই।'

আরো কয়েকজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসে যান।'

কিন্তু বসব কোথায়। ছাঁট অবশ্য লাগছে না, লাগবার কোন সম্ভাবনাও নেই। যে কোন ভাল বাড়ির থেকে এ আশ্রয়টি খারাপ নয়। আর বসতে যাবই বা কেন? জিজ্ঞেস করলুম, 'ব্যাপারটা কি হচ্ছে?'

জবাব দিল সেই রিক্‌শাওয়ালাটিই। বলল, 'আপনি অনাথকে চেনেন তো? অনাথ আর কালার বউকে?'

অনাথ আর কালার বউ! কই মনে পড়ছে না তো। তারপরে বুঝলুম, অনাথ আর কালার বউ, দুজনেই ভিক্ষুক। এই শহরেই ভিক্ষে করে। ষ্টেশনটা তাদের কেন্দ্রস্থল। অনাথ নিতান্তই অনাথ। সে নাকি নদে জেলারই কোন গ্রামের খাঁটি ব্যাগ্রক্ষত্রিয়দের পূজারী বামুন ছিল। কপাল গতিকে এখানে এসে ভিক্ষুক হয়েছে। এমন কি, তার নাকি ভিটেমাটিও ছিল এককালে! বিয়ে থা আর হয়নি। কেউ ছিলও না দেবার। এখন 'দবিদ্দর বোরাস্তনের ছেলেকে একটি পয়সা দিন' বলে ভিক্ষে করে। বয়স দেখায় প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশের মত। কিন্তু সে বলে, একুশের বেশী নয়।

আর কালার বউ যে কোন কালার বউ, তা' কেউ জানে না। বৃন্দাবনের কালা নয়, এটা সবাই জানে। গত মন্বন্তরের সময় এ থেকে এ শহরে আছে। কালা বলে তার এক স্বামী ছিল। সে মারা গেছে ছেলেমেয়ে ছিল কয়েকটি। তারাও মরে গেছে।

কিছুদিন থেকে অনাথ কালার বউয়ের কাছে প্রেম নিবেদন করছে। এ নিয়ে, রাস্তাঘাটে কালার বউ অনাথকে গুষ্টিশুদ্ধ উদ্ধার করেছে। এখনো তার গতর আছে, ভিক্ষে করতেও পারছে। শুধু শুধু অনাথের কাছে থেকে আবার এক গাদা বিয়োবে কেন? অনাথ তাকে খাওয়াবে পরাবে কি? ছেলেপুলে হলে কি পুষবে? ন্যাড়া বেলতলায় যায় কবার! অতই যদি দুঃখ সইতে পারবে কালার বউ, তবে এই শহরে অনেক বাবুর কাছেই সে যেতে পারত। পয়সাও মিলত। কিন্তু রেলপুলের তলায় বিয়োতে হত—

যাক্। কিন্তু অনাথ ভিক্ষে বন্ধ করে প্রায় অনশনে মরতে বসল। কালার বউকে সে ভালবেসেছে, তাকে না পেলে নাকি মরবে।

মরুক। কালার বউ বলেছে, যদি তাকে পেতে হয়, তবে বিয়ে করতে হবে, দরকার হলে খাওয়াতে পরাতে হবে। অনাথ তাইতেই রাজী। মিছিমিছি নয়। ফাঁকি হলে তাকে কালার বউ এ শহরছাড়া করে ছাড়বে। মেরেধরে তুলো ধোনাও করতে পারে।

স্টেশনকেন্দ্রের ভিক্ষাজীবী মেয়ে পুরুষেরা গভীর অভিনিবেশ সহকারে ব্যাপারটি ভেবেছে। তারপর এক বাক্যে রায় দিয়েছে, ভিক্ষুক বলে কি তারা মানুষ নয়, না, তাদের আর বিয়ে-থা' ব'লে কিছু নেই! সুতরাং বিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে। সকলে তাদের রুজির পয়সাও দিয়েছে বিয়ের খরচের জন্য। এখানে একটি মন্দিরের সামনে, কপালে সিঁদুর লাগিয়ে আর গলায় রুদ্রাক্ষ দিয়ে একজন ভিক্ষে করে। সে ব্রাহ্মণ। বিয়ের মন্ত্র পড়ার পুরোহিত সে। রিক্শাওয়ালা দুজন আছে, তাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই রাত্রে। মালিকের ঘরে রাত্রে ফিরে না গেলেও ক্ষতি নেই। তারাও বিয়েটা দেখে যাবে। তা'ছাড়া স্টেশনের লাইসেন্স-বিহীন দুজন কুলি আছে এই বিয়ে বাসরে। গুটি তিনেক কুকুর। তারপরে আবার আমি এসে হাজির হলাম আর একজন বাইরের লোক।

এতক্ষণে আমি ভাল করে সকলের মুখের দিকে তাকালাম। চোখাচোখি হতেই অনাথ সলজ্জ হেসে মাথা নীচু করল। কালার বউ ঘোমটা টেনে দিল।

শুনলুম মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে! এবার সাত পাক ঘোরা হবে। এমন সময়ে আমি এসেছি। দেখলুম, শাল পাতায় ঢাকা রয়েছে কি সব। বোধহয় কিছু তেলেভাজা জাতীয় খাবার আনা হয়েছে। কেন না কুকুরগুলি ওই দিকেই চোখ পিট পিট ক'রে তাকাচ্ছে।

এখন তর্ক হচ্ছিল বিয়ের অনেক নিয়মকানুন নাকি ঠিক হয়নি। এখানকার অনেকেই এবিষয়ে অভিজ্ঞ এবং রীতিমত বিবাহিত। সাতপাকের আগে, সেইটার বিহিত হোক।

বসতে পারলুম না। দাঁড়িয়েই রইলুম। জীবনে যে এমন বিয়ে দেখতে হবে, কোনদিন ভাবিনি। এমন বিয়েও যে আবার হয়, তা' জানতুম না। এখানেও যে নিয়মকানুন নিয়ে আবার বাকবিতণ্ডা হতে পারে, সেটাও কল্পনাতীত ব্যাপার।

এবার একটি আধাবুড়ি বলে উঠল, 'আমার কাছে চালাকি চলবে না। সস্তাগণ্ডার দিনে আমার বাপ একশো, এক আধটাকা নয়, একশো টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়েছিল। ওসব বিয়ের আচার বিচার আর আমাকে শিখুতে হবে না।'

খনখনে গলা বুড়ি, শনন্নুড়ি চুল দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, 'সে কি তোর একলার। আমার বে'তে একশটা নোক খেয়েছিল। ঢাক ঢোল কাঁসী বাভি বাজনা, সে একেবারে কি কাণ্ড!'

রিক্‌শাওয়ালাটা এবার চটে উঠে বলল, 'আরে দুত্তোর নিকুচি করেছে বাভি বাজনার। আমি এবার আমার গাড়ির বাতি নিয়ে চলে যাব কিন্তু। বলছি তখন থেকে যে, এটা বেওয়ারিশ বিয়ে, চালিয়ে নেও যা হোক ক'বে, তা' নয়, এখন আবার আচার বিচার!' একজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সময়মত আবার ভোরবেলা গিয়ে কাচারীর কোণটাতে আমাকে বসতে হবে। নইলে গাঁয়ের বুড়ো কানাটা এসে বসে পড়বে।'

একটি খোঁড়া ভিখারী বলে উঠল, 'ওদিকে তেলেভাজাগুলি চুপসে জল হয়ে গেল।'

বসন্তের দাগ ধরা ভয়ঙ্কর মুখো লোক একটি বলে উঠল, 'অমনি নোলা দিয়ে জল ঝরছে। শালা ভিখিরী কোথাকার!'

উপযুক্ত গালাগাল! কিন্তু খোঁড়া গেল ক্ষেপে। বলল, 'কী! জাত তুলে গালাগাল! জানিস, ওকথা বললে বাবুদেরও ছেড়ে দিইনে!'

রিক্‌শাওয়ালা আমার দিকে ফিরে হেসে বললে, 'দেখছেন তো শালাদের কাণ্ড। ভেবেছিলাম আজ এট্টু বায়স্কোপ দেখব। তা'পর ভাবলাম যে, না এ ব্যাটাদের বিয়েটাই দেখে যাই। তা' কি ঝগড়াটাই লাগিয়েছে তখন থেকে।'

কিছু বলতে পারলুম না। হাসতেও পারলুম না। যদি কিছু মনে করে বসে। এরা সকলেই নিজেদের মধ্যে জানাশোনা। আমি অজানা। তা' ছাড়া, সবটা মিলিয়ে, এদের সেই করুণ, দয়াভিক্ষা করা কাঁদা কাঁদা ভিখারী মনে হচ্ছিল না এখন। বরং রাগে বিদ্রূপে এই অদ্ভুত পরিবেশে এক অন্য জগতের মানুষ মনে হচ্ছিল। দেখাচ্ছিল আরো ভয়ঙ্কর।

ইতিমধ্যে দুই বুড়িতে তর্কাতর্কি জমে উঠেছে। পুরোহিত হা করে দেখছে সব। কালার বউয়ের চোখে রাগ। অনাথের ব্যস্ত অস্থিরতা।

তারপর অনাথের আর সহ্য হল না। সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'বে'টা হতে দেবে, না উঠে পড়ব। এ তো আর গাঁয়ে ঘরে বিয়ে হচ্ছে না যে নিয়মকানুন সব মানতে হবে। আব যদি বাগড়া দাও তো বল, উঠে পড়ি।'

সব চুপ। কেবল একজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ এবার ঘুরিয়ে দেও, ঘুরিয়ে দেও সাতপাক। রাগারাগির দরকার নেই।'

হঠাৎ একটা বাতি নিভে গেল। তেল নেই আর। আরো অন্ধকার হল। একটি বাতির আলোয় আরো ভয়ঙ্কর হল মূর্তিগুলি। আমার ছায়াটা আলাদা করে খুঁজলুম, পেলুম না।

খনখনে গলা বুড়ি বলল, 'কত আলো জ্বলেছিল আমাব বিয়েতে—'

আধা বুড়ি বলল থেমে থেমে, 'আমার সময়ে আটটা হ্যারিকেন জ্বলেছিল।'

এক চোখ কানা একজন মোটা গলায় বলে উঠল, 'আঃ, এবার থামাও ওই কথাগুলি। আমি আর সহ্য করতে পারি না।....'

'আচ্ছা, আচ্ছা ঘোরাও। কালার বউকে তুলতে হয় যে। কে কে তুলবে?'

রিক্‌শাওয়ালা বসেছিল রিক্‌সার উপরেই। হঠাৎ সীটটা চাপড়াতে আরম্ভ করল। বাজনা বাজাচ্ছে।

খোঁড়া উঠল আগে। কালার বউকে তুলবে।

কিন্তু আবার গণ্ডগোল। কনে কালার বউ বলল, 'সাতপাক হবে না, বে' হবে না। আমার মন নেই।'

এক মুহূর্ত সব চুপ। অবাক গুলতানি। কেন, কি হল! সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে এখন সীতা কার বাপ!

কালার বউ নীরব। কিন্তু তার রাগ নেই, চোখা চোখা কথা নেই। খালি নীরব। ঘোমটা খসে পড়েছে, জট পাকানো চুলগুলি ছড়িয়ে পড়েছে ঘাড়ে। মুখের একদিকটা দেখা যাচ্ছে না একেবারে। আর একদিক ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা। মানুষ বলে মনে হয় না।

তার পাশে অনাথের অবস্থা কহতব্য নয়। তিন ভাগ অন্ধকার, এক ভাগ আলোয়, অনাথকে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। তার সারা মুখে বোবা অস্থিরতা ও যন্ত্রণা। সে প্রায় ছেলেমানুষের মত চিৎকার করে উঠল, 'ওলো কেন বল···তোর পায়ে পড়ি।'

মনে মনে বললুম, ঠিকই। এছাড়া, বয়োচিত কথা আর কি বলতে পারত অনাথ।

কালার বউ পরিষ্কার ব'লে দিল, 'আমি বে' ক'রে আর ভিক্ষে মাগতে পারব না। আর, কারুর ভিক্ষের ভাতও খেতে পারব না। তা এখন যাই বল।'

সবাই তো হাঁ। তবে কি করতে হবে?

কালার বউ বললে, 'সোম্‌সারে যা করে নোকে। কাজ করে, সোম্‌সার করে। ভিক্ষেই যদি কবব, তবে আবার এসব কেন। না বাপু না, এই নেও তোমাদের নতুন শাড়ী—'

বলতে বলতে সে তার ছেঁড়া ধোকড়া ন্যাকড়াটা টেনে নিল পরবে বলে। এখনো পরণে তার, সকলের দেওয়া লালপাড় শাড়ি।

সবাই স্তম্ভিত। অনাথ দেখছে সকলের মুখ। আমার পাশে রিকশাওয়ালাটিও গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

কালার বউ আবার বলল, সব গেছে বলেই না আজ ভিখিরী হয়েছি। যদি থাকত! আর আবার যদি হবেই···'

থেমে হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে উঠল,···'পেথম যখন বে হয়েছিল।'

রিকশাওয়ালা আরো গম্ভীর ; কিন্তু চাপা খুশী চোখে সে কালার বউকে দেখছে। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে খুব বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকতে লাগল। অর্থাৎ, দেখছেন তো।

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে উঠছিল। তিরিশ টাকা আর ছাড় মাল খেয়ে আমি বিয়ে করিনি। ভিক্ষুকের বিয়েতে কোথায় একটু মজা দেখছিলুম, তা নয়, ভিখারী বেটির আবার মান। আসরটাকে দিলে জুড়িয়ে।

কালার বউ কাপড় খুলতে যাবে, রিকশাওয়ালা তার গাড়িতে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'ত্যাখ অনাথ, তুই কাজ করতে পারবি ?'

অনাথের চোখে আলো দেখা দিল, বললে, 'পারব।'

: চুরি করবিনে ?

: আমি বেরাম্ভনের ছেলে—

: থাক্ ঢের বেরাম্ভন দেখেছি। ঘর ঝাঁট দিতে পারবি ?

: পারব।

: বাবুর সঙ্গে কলকাতা থেকে মাল বয়ে নিয়ে আসতে পারবি ?

: খুব খুব।

: বেশ আমাদের রিকশা মালিকের গদীতে কাল তোকে নিয়ে যাব। কাজ মিলিয়ে দেব।

এবার আমারই হাঁ হওয়ার পালা। অন্যান্য লোকগুলি পাথর। তারপর হঠাৎ সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'তা হলে অনাথ আর ভিখিরী নয় ?'

রিকশাওয়ালা বলল, 'হাঁ, এখনো ভিখিরী। সাত পাকটা দেও ঘুরিয়ে।'

: তা'হলে ? কি বলিস্ কালার বউ ?

কালার বউ ঘোমটা টেনে বললে, 'তা'হলে হোক।'

অনাথের আর হাসি ধরেনা মুখে। থোঁড়া উঠল সকলের আগে, তারপরে এক চোখ কানা।

সাতপাক ঘোরানো হচ্ছে আর সবাই চীৎকার করছে, 'এবার আমরাও একটা করে বে করব মাইরি-ই-ই…।' তারপর শুভদৃষ্টি। আমি ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছি। কেননা, বিয়ে বাসরটা কেমন যেন ভিজে গেছে। ভিজে ভিজে, কান্না মাখা। একটা অন্য রকমের চাউনি সকলের চোখে। ঠিক ভিক্ষুকের আসর আর নেই।

রিকশাওয়ালাটি পেছন পেছন এসে বলল, 'সাঁতরা বাবুর দোকানে যাবেন ?'

বলললুম, 'হ্যাঁ।'

ওরা তখন খাচ্ছে আর কুকুরগুলি করুণ গলায় কোঁ কোঁ করছে।

ফটিচার

অনেক রাত হয়েছে। রাত এগারোটা হবে। শহরতলির বড় রাস্তা ফাঁকা হয়ে এসেছে। বন্ধ হয়ে গেছে অধিকাংশ দোকানপাট। শীতটা এখনো যায়নি। যাই যাই করছে। তবু এখনো সন্ধ্যের পরই সবাই ঢাকা-ঢুকি দিতে আরম্ভ করে। রাতটা জড়োসড়ো হয়ে পড়েছে। জবু-থবু হয়ে পড়েছে কম্বল মুড়ি দিয়ে। আস্তানা খুঁজছে রাস্তার কুকুরগুলি। মৌরসী আস্তানা নিয়ে একটু দাঁত খিঁচুনি কিংবা সামান্য আঁচড়াআঁচড়িও চলছে। হোটেলখানাগুলি বন্ধ হয়নি একেবারে। গোছগাছ, ধোয়া-মোছা চলেছে। রুটি স্যাঁকার তন্দুরগুলি হাঁপাচ্ছে। কেউ কেউ হাঁপাচ্ছে তন্দুরের উপরের জায়গাটা দখলের জন্য। শীতে ওম্ হবে অনায়াসে।

রাস্তাটা এঁকেবেঁকে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। আকাশের তারাগুলি শীতে কুঁকড়ে আড়াল হয়ে যাচ্ছে কোথায়। রাস্তার বাতিগুলি শীতে স্থবির।

সুরটা বেজে উঠল এ সময়ে। প্রায়ই বাজে। অল্প উত্তুরে হাওয়া। শব্দটা ধিকিয়ে ধিকিয়ে বাইরে আসে। গলি থেকে আসে শব্দটা। পুরনো রেকর্ডের বাজনার মতো। একটু ধরা ধরা গলা। কিন্তু মিষ্টি কাঁচা গলা। গলার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-সঙ্গীতও কম নয়। পিয়ানো জাতীয় একটা কিছু আছে সঙ্গে। গিটারের কাঁপা কাঁপা গোঙানি। আর ডুগি-তবলা। ডুগিটা একটু বেশি বুং বুং করে।

গান বাজছে তেরো নম্বর গলিতে। দি নমিতা সাইকেল ওয়ার্কস্-এ। টিনের চালাঘর। একটা পাকা ঘরের দেয়াল থেকে চালাটা নেমে এসেছে রাস্তার ধারে। ছিটে বেড়ার ঝাঁপ খোলা। ভেতরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। বাইরে একটা কালো রঙের টিনে

লেখা আছে, 'দি নমিতা সাইকেল ওয়াকর্স'। নিচে, 'সাইকেল, রিকশা, ও লাইট, গ্রামোফোন সুলভে মেরামত করা হয়। প্রোঃ শ্রীরতনলাল পাঠক।' কথাগুলি প্রায় ছবি হয়ে গেছে। নমিতার 'ন' যদি ছ' ইঞ্চি হয়ে থাকে, তাহলে 'মি' তিন ইঞ্চির বেশি নয়। লেখক স্বয়ং প্রোঃ শ্রীরতনলাল পাঠক। ন্যাকড়ার তুলি দিয়ে গভীর অধ্যবসায়ের ফল ওটা। মরচে-পড়া টিনের চালার সঙ্গে মেশামিশি করে আছে। বিশেষ কারুর নজরে পড়ে না। চেনা বামুনের পৈতে অপ্রয়োজনীয়। সাইনবোর্ডটা সেই রকম।

চারটে সাইকেলরিকশা চালাঘরটা জুড়ে রয়েছে। একপাশে নড়বড়ে টেবিল, তার উপরে ময়লা খাতা, পেন্সিল, হ্যারিকেন। সামনে একটা টুল। পেছনে পাকা ঘরের দেয়াল। দুটো সিঁড়ি উঠলে বন্ধ দরজা। দরজাব নিচে খানিকটা জায়গা মেরামতের জন্য ফাঁকা।

ফাঁকা জায়গাটাতে বসে গান হচ্ছে। হ্যারিকেনের আলোতেও বোঝা যাচ্ছে না ক'টি লোক বসে আছে। যেখানে একজোড়া ঠ্যাং ঠিক তার নিচেই একটি মাথা। মাথাব পাশেই আবার একটা পিঠ কিংবা বুক! এই মানুষের পিণ্ডটা প্রদক্ষিণ করলে টের পাওয়া যায়, জনা চারেক জড়াজড়ি কবে আছে। তিনজন মুখে হাত দিয়ে সঙ্গত করছে বিচিত্র স্ববে। ঠোঁট আর জিভেই তাদের যন্ত্র-সঙ্গীত। বাকি একজন গান করছে। হঠাৎ শুনলে মনে হয় পুরনো রেকর্ড বাজছে।

গানটা যখন জমে উঠেছে, তখন পাকা ঘরের দরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে এল রতনলাল। আর একটি মুখ উঁকি মারল দরজার আড়াল থেকে। মেয়ে-মুখ। একমাথা রুক্ষ চুল, খসা ঘোমটা আর ছোট ছোট চোখ। এক মুহূর্ত। তাকাতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

গান বন্ধ হল না। সুরটা স্তিমিত হল একটু। জট-পাকানো মানুষের পিণ্ডটা একটু নড়ল। আটটি চোখ রতনলালকে দেখল

একবার। আবার গান হতে লাগল পুরো দমে। রীতিমত ভাব দিয়ে দিয়ে,

সাথী ছোড় গয়ী

অব কহাঁ বাসরা আপনা—

রতনলাল ঘাড় কাত করল। চোখ বুজে মাথা নাড়ল বার কয়েক। কেঁপে কেঁপে উঠল লোমহীন ভ্রূ জোড়া। মনে হল গানের সমঝদার সে। খুঁটে খুঁটে বিচার করছে যেন। মোটা শরীরটা দুলছে। শীতে বিশেষ কাবু নয় সে, বোঝা যাচ্ছে। গায়ে একটি মাত্র শার্ট। তাও বুক খোলা। চুলগুলি উলটে পড়তে গিয়ে থমকে আছে যেন। কাপড় পরেছে মালকোচা দিয়ে।

গানে বাধা না দিয়ে সে এসে বসল তার টুলে। গান শেষ হল। গাইয়ে-বাজিয়ের দল বসল সারি সারি।

রতনলাল চোখ বুজেই বলল, 'বা, চমৎকার, পয়সা দিলে শোনা যায় না এরকম।'

গলাটা চাপা আর সরু রতনের। স্বরটা চেহারার মতো নয়। কিন্তু গলার স্বরটা গম্ভীর আর মোটা করার জন্য সবসময় সে থুত্‌নিটা প্রায় বুকে ঠেকিয়ে কথা বলে। তাতে মোটা না হোক, বিকৃত শোনায়। সে যেন কিসের ঘোরে সবসময় আচ্ছন্ন। নাক কুঁচকে, চোখ পাকিয়ে আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ তার চলা-ফেরা।

হঠাৎ দাঁড়াল উঠে। তর্জনী নেড়ে বলল, 'পিল্লু, হ্যাঁ পিল্লু এরকম গাইত। গলার মধ্যে তার একটা মায়া ছিল। জেল ওয়ার্ডারদের পর্যন্ত ভুলিয়ে দিত গান গেয়ে। তার মানে?' বলেই একবার মাথা ঝাঁকানি দিল রতন।—'তার মানে, বনের বাঘ পোষ মেনে যেত সেই সুরে। খেলা নয়, জেল-পাহারাদার ভুলে যেত।'

সেই চারজনেই ভূতের মতো ছায়া হয়ে গেছে রতনের ছায়ার আড়ালে। একজন বলে উঠল, 'আচ্ছা?'

'হাঁ, হাঁ,!' রতন আরো উদ্দীপ্ত হল। বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলল, 'তা বলে ওই সব গান?

'সাথী ছোড় গয়ী? আরে ছোঃ! শালা, জনানার কান্না! ওসব সাথী তো শালা বেইমান। সিনেমাতে 'ওরা খুব ভালো। আমরা রাজবন্দীরা পিল্লুকে নতুন গান শিখিয়ে দিলাম', বলে বুক টান করে দাঁড়াল রতন।—'রাজবন্দী, মানে? বিপ্লবী। এই আমি, খোদ শিখিয়ে দিলাম, বললাম, পিল্লু, তুই চোর, কিন্তু তোর জিন্দেগী বদলে যাবে, এমন গান শেখাবো। গা আমার সঙ্গে।'

রতন ঘাড় নামিয়ে, চোয়াল ফুলিয়ে নিজেই গান ধরে দিল,

'আশমান মে ঝাণ্ডা উড়াকে
চল মজদুর পুকারকে।—'

ঘটাং করে পাকা ঘরের দরজাটা খুলে গেল। সেই মেয়ে মুখ। শোনা গেল, 'কি হচ্ছে কি? ছেলেপুলেরা ঘুমোবে না? রাতদুপুরে আদিখ্যেতা।'

আবার দড়াম করে শব্দ। বাধাপ্রাপ্ত রতনলাল ক্রুদ্ধ কটাক্ষে একবার খালি দেখল। তারপর চুপ। হাত পা শক্ত। মুখ বিকৃত, যন্ত্রণাকাতর। যেন কি একটা লণ্ডভণ্ড ঘটে গেল ঘরটার মধ্যে। ছায়া চারটিও কেমন কাত্ হয়ে রইল।

রতনলালের যন্ত্রণাটা তাদের মুখেও ছড়িয়ে পড়ল যেন।

রতনলাল ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ইস্ক্রুপ্ ঢিলা হয়ে গেল। যত আঁটো, এরা খালি শালা ঢিলা করে দেবে। এরা বুঝবে না, সে কি জিনিস! সেই গানে জেলের দরজা কাঁপত থর্‌থর্ করে। বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠত, মাইরি! মনে হত, মজদুররাজ কায়েম হতে যাচ্ছে। হাঁ, সেই গান গাইতে হবে। বিপ্লবের গান।'

চারটে ছায়া গায়ে গায়ে মিশে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ধ্বক্‌ধ্বক্ জ্বলতে লাগল রতনের চোখ। বলল, 'তুবে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের মিস্তিরি ছিলাম, আমি মজদুর। আমি জানি, মজদুর কি চায়। ছাখ্ আমি সেইজন্য জেল খেটে এলাম। নয় কি?'

ছায়া চারটে প্রায় একসঙ্গে কলের পুতুলের মতো বলে উঠল, 'হাঁ।'

রতন গলাটা যথাসম্ভব মোটা করে বলল, 'আমি বামুনের ছেলে। আমার বাপ কেরানী ছিল। আমি মজত্বর হয়েছি। মানুষ এইরকম ধাপে ধাপে আজ নেমে যাচ্ছে। বউয়ের গয়না বেচে, ধার করে আমি একটা একটা করে রিকশা কিনেছি। কেন? না, পেট চালাতে হবে। কিন্তু এসব কিছুই থাকবে না। আমি তো জান দিয়ে দেব।'

হক্‌চকিয়ে গেল চারটে মানুষ। ধুলো মাখা উসকোখুসকো চারটে শীতার্ত জবুথবু ভূতের মতো। রতনের ছায়ার আড়ালে চোখগুলি গোল হয়ে উঠল তাদের। মুখগুলি হাঁ হয়ে গেল।

রতনের মনে হল, সে হা হা করে হেসে উঠবে। কিন্তু উঠল না। বলল, 'একদিন তো দিতেই হবে জান্। একলা নয়, তোরাও সেদিন যাবি আমার সঙ্গে, ত্বনিয়ার মানুষ যাবে। যাবিনে?'

তারা ঘাড় নাড়ল। সংশয়ে, বিস্ময়ে, জানা-অজানার এক বিচিত্র ত্বর্বোধ্য ভাবে। ভাবখানা, তা হয় তো-যেতে হবে।

'হাঁ যাবি, যেতে হবে লড়ায়ের ময়দানে। তখন গাইতে হবে, ওই রকম করে।'

আরো হয়তো কিছু বলত রতন। বারোটার ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং ঢং করে। সে তার টুলে বসল আবার। পেন্সিল নিয়ে সিস্‌টা জিভে ঠেকাল বারকয়েক। যেন তাহলে লেখাটা ভালো হবে।

তারপর, ঝুঁকে পড়ে খাতায় বড় বড় করে লিখল, 'আজীব ত্বনিয়া', 'এগিয়ে চল' 'কোন্ পথে'। এগুলি তার রিক্‌শার নাম। সাইনবোর্ডটা সে নিজে লিখেছে। কিন্তু, এগুলি সে খরচা করে লিখিয়েছে রিক্‌শার গায়ে। এ অঞ্চলে শুধু তার রিক্‌শাতেই নাম আছে। আর কারুর নেই।

এখন তার অন্য কাজ। তবু ভাবভঙ্গি, কথার সুরে কোথাও পরিবর্তন নেই। ডাকল, 'আজীব ত্বনিয়া! রোজের এক টাকা, বকেয়া পাঁচ টাকা চার আনা।'

অর্থাৎ আজীব ত্বনিয়ার চালকের কাছে সে পাবে রোজকার এক টাকা। আগের বাকি পাঁচ টাকা চার আনা।

আজাব দুনিয়া এগিয়ে এল মাথা চুলকোতে চুলকোতে। নড়বড়ে টেবিলটার উপর রাখল একটি টাকা।

রতন এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে তার দিকে কট্‌মট্‌ করে একবার তাকাল। তারপর, 'এগিয়ে চল! রোজের এক, বকেয়া বারো টাকা।'

এগিয়ে চল এল এগিয়ে। প্রথমে দিল একটাকা। তারপরে আনি, দুয়ানি, সিকি, মিলিয়ে দিয়ে বলল, 'বকেয়া সাড়ে তিন রুপেয়া।'

রতনের লোমহীন কোঁচকানো ভ্রূ একটু সটান হচ্ছিল। তার আগেই এগিয়ে চল গায়ের ন্যাকড়া জাতীয় চাদরটি ভালো করে জড়িয়ে বলল, 'দুটো ইস্পোক্‌ টুটে গেছে।'

অর্থাৎ দুটি স্পোক্‌ খরচাটা রতনের। ভাঙাচোরা মালিকের দায়। অবশ্য ভাঙাচোরা যদি আবার ন্যায্য হয়। ভ্রূর চামড়া তেমনি বেঁকেই রইল রতনের। নাকের চামড়া কুঁচকে, পাটা দুটো ফুলল আর একটু। ডাকল, 'কোন্‌ পথে, এক। বকেয়া দেড়।' কোন্‌ পথের পা উঠছে না। উদয়ের পথে ধাক্কা দিতে প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে সামনে পড়ল। বয়সটা তার একটু বেশি! গোঁফজোড়া পাঁশুটে হয়ে গেছে। চোখ পিট্‌পিট্‌ করে ট্যাঁক হাতড়ালো খানিকক্ষণ। তারপর আট আনা বার করে টেবিলে রেখে মাথা নিচু করল।

রতনের উত্তেজিত মুখে দুরন্ত ঘৃণা। বোধ হয় আধশোয়া চুলগুলিও খাড়া হয়ে উঠল। কিন্তু কিছু বলল না। আটআনা জমা করে সবে উদয়ের পথেকে ডাকবার উপক্রম করেছে, কোন্‌ পথে বলল, 'চেইন থোড়া টাইট্‌ হয়ে গেছে। তেল মেরে ঢিলে করতে হবে।'

সেটা অবশ্য তেমন কিছু খরচ নয়। তবু রতনের গায়ে যেন ছুঁচ বিঁধল। তার কথার মাঝেই সে ডাকল, 'উদয়ের পথে, এক। বকেয়া চার আনা। 'একটা বেল খোয়া গেছে, তার দাম দেড় টাকা।' উদয়ের পথে ছেলেমানুষ বলা যায়। বছর ষোলো বয়স। সবে

লোম গজিয়েছে গালে। একটা বেল তার গাড়ি থেকে চুরি হয়েছে কিছুদিন আগে। এই শীতে তার গায়ে একটা গেঞ্জি শুধু। কণ্ঠার হাড়গুলি ঠেলে উঠেছে। একটা টাকা দিয়ে সে বলল, 'রোজ-টাকা, বকেয়া চার আনা কাল, বেলের দাম আপোস পরশু হবে।'

জিভে বারকয়েক পেন্সিল ঠেকিয়ে সে যোগ করল। তারপর ফিরল। সাংঘাতিক মুখের অবস্থা। যে রকম মুখে সে এর আগে কথা বলেছে। কিন্তু কথা বলল চাপা গলায়, 'ছুটো গাড়ির বডি খারাপ হয়েছে। চারটে গাড়ির সবশুদ্ধ তেরোটা ইস্পোক লাগাতে হবে, কুল্যে চারটে চাকা টাল, একটার গিয়ার ক্ষয়ে গেছে, ছুটোর পাডিলের পাদানি চাই। সিট খারাপ, হুড্ খারাপ······'

বলতে বলতে গলা ধরল রতনের। 'এর উপর নিজের হাতে সব মেরামত করি। একটা মিস্তিরি রাখলে শালা আমার মরা বাপ ফের বেঁচে উঠত।' পরমুহূর্তেই একেবারে চিৎকার করে খেঁকিয়ে উঠল, 'সব শালা চার নম্বর গলির ভেড়া, মোটকা সা-কারখানার পোকা, থুক্! থুক্ থুক্ থুক্ দিই আমি তোদের। নিকাল যাও শালা। যাও। চার্ নম্বর গলি আর মোটকা-সা ছাড়া তোদের কেউ জ্যান্ত খেতে পারবে না। তোরা সেখানে যা।······'

কিন্তু কেউ গেল না। চার নম্বর বেশ্যাপল্লী। মোটকা-সা'য়ের কারখানা দেশী সরাপের দোকান। যাওয়া কারুর অভ্যাস থাকলেও উপায় নেই। ট্যাঁক পকেট সবই শূন্য। যেন চারটে বলবুদ্ধিহীন বলদ। রতন একটা খ্যাপা গাড়োয়ান। রতন বিস্ময়ে রাগে আবার বলে উঠল, 'আমাকে ছুবে ইঞ্জিনিয়ারিং ঠকিয়েছে, গরমেণ্ট জেল খাটিয়েছে, আর আমাকে তোরা ঠকাচ্ছিস্? নিকাল যা।' কোন্ পথে একটু বয়স্ক মানুষ। গোঁফ জোড়া কেঁপে উঠল তার। কাঁচুমাচু করে বলল, 'সচ্ বলছি, ঠকাবার মতলব একদম নেই। আপ একঠো শরীফ্ আদমি······'

রতন তেড়ে এল, 'চুপ, তুই বুড়ো সবচেঁয়ে খচ্চর। আড়াই টাকার জায়গায় আট আনা দিয়েছিস্। যেতে আসতে শিবমন্দিরে

মাথা ঠুকিস্, ডবল শয়তান তুই। জানিনে ভেবেছিস্? যে ঠাকুর মানে, সে হয় সবচেয়ে পাজী, মজতুরের তুশমন। নইলে এ বয়সে গোঁফ চুমরে গিটার বাজাস্ মুখ দিয়ে?'

বলে গিটারের শব্দ অমুকরণ করে ভেংচে উঠল। উত্তেজনায় সে বসল, দাঁড়াল, আবার বসল।

কোন্ পথে কাঁপতে লাগল শীতে। এতক্ষণে উত্তরে বাতাসটা আবার বইতে আরম্ভ করেছে। সকলেই কুঁকড়ে গেল একটু। হিস্ হিস্ শব্দও হল। কিন্তু রতনের সে সব নেই। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, মনের উত্তাপে এবার সে ঘামবে। ভ্রূ কপালে ঠেকিয়ে সে বলল, 'আর তোদের আমি বিপ্লবের কথা বলি? আরে ছোঃ। বেইমান কখনো বিপ্লবী হয় না। ধোকাবাজ কোনোদিন বিপ্লব করতে পারে না। সে পারে একজন সাচ্চা মজতুর। মালিক যাকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে হাড় মজ্জা খেয়ে ফেলেছে, সেই শোষিত মজতুর। আমি তাদের চিনি, নাড়ি নক্ষত্র চিনি। আমি নিজেকে চিনিনে? আর তোরা আমাকে ঠকাচ্ছিস্। আমার শালা পাঁচটা ছেলেমেয়ে, একটা বউ, একটা বিধবা মা, তোরা আমাকে শুষিস্? শালা ঘেসো জোঁকের দল! শুঁড় ছোট হলে কি হবে, নোলা তোদের সব সময় ছোঁক ছোঁক করছে।'

উদয়ের পথে ছোকরা আর সহ্য করতে পারল না। শীতের জন্য তু'হাতে বুক আঁকড়ে ধরেছিল। তু'হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে বলল, 'মাইরি বলছি বাবু—'

কিন্তু রতনের মুখের তোড়ে সে সব ভেসে গেল। নিজের কথার সুরে সে মশগুল হয়ে গেল। তার বিশাল ছায়াটা তুলতে লাগল। সে বলে গেল।

'সাচ্চা মজতুর প্রহর গুনছে। দম-আটকানো অন্ধকার রাত তার টুটি টিপে মারতে আসছে। কখন, কখন ভোর হবে! অত্যাচারের অবসান হবে! আসবে সেই……'চেপে এল, কেঁপে কেঁপে উঠল রতনের গলা। যেন গোলাপী নেশায় তেজীয়ান হয়ে উঠতে লাগল

সে। চারটে লোক ভড়কে গেল একেবারে। নিস্তব্ধ ঘর। রিকশা, যন্ত্রপাতি সব যেন অবাক বিস্ময়ে এইদিকেই তাকিয়ে আছে। রাত্রিটা গেছে স্তব্ধ আড়ষ্ট হয়ে। চারটে লোক যেন এক বিচিত্র ছায়াজগতে এসে বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল রতনের দিকে। যেন, সত্যি কোনো করাল রাত্রি থাবা মেলে আসছে চারদিক থেকে।

ঠিক এই সময়েই আবার ঘটাং। দরজা খুলল। সেই মুখ, এবার আরো ক্রুদ্ধ। শোনা গেল আরো তীব্র গলা, 'অনেক রাত হয়েছে, এবার শুতে হবে না ?'

থেমে গেল সরু গলার সুতো কাটা। একটা ধাক্কা খেয়ে হেঁচকি উঠে গেল রতনের গলায়। চারজনের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল! তারপর একে একে সব বেরিয়ে গেল চালাঘর থেকে। বাইরে গিয়ে ঝাঁপটা ঠেলে দিল। রতন যন্ত্রের মতো তালাবন্ধ করে দাঁড়াল। যেন কোন নিশির মোহ ঘিরে ধরেছে তাকে। যে কথা বলছিল, যেন তার খেই খুঁজছে।

এ প্রায় প্রত্যহের ব্যাপার।

ওরা চারজন বেরিয়ে, একসঙ্গে এগুল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। চারজন জড়াজড়ি করে, পরস্পরের গরমে ওম্ করতে করতে চলল। উত্তরের বাতাস থেকে থেকে আসছে। গাছে গাছে পাতা ঝরছে। তারাগুলি চলে গেছে আরো দূরে। মিইয়ে গেছে ঝিকিমিকি।

একজন বলল, 'সত্যি, শালা কি যে করি!'

আর একজন বলল, 'মাইরি!'

কোন্ পথে বুড়ো বলে উঠল, 'সচ্ বলছি, কত শোচলাম কি যে, আজ পুরা বকেয়া জরুর মেটাবো। মগর, হল না। লেডি মাস্টর বারো-হানা দিল। আর দিন ভর অগল বগল ঘুরে মিলেছে বারো-হানা। কত্নি ভইল্ ?'

আজীবহুনিয়া বলল, 'দেড় টাকা।'

গোঁফ জোড়া ঝুলে পড়ল কোন্‌পথের। 'তব্, কি হবে ?

লেড়কা নিয়ে গেল ঘর-খরচা আট-হানা। চা-বলা পাবে দু'টাকা। ছিনিয়ে নিল আট-হানা। আর আট-হানা—'

দেখা গেল, মধ্য রাত্রের এই শীতে, পথের উপরেই দাঁড়িয়ে পড়েছে তারা। হিসাব দিতে আরম্ভ করেছে এরটা ওর কাছে। ওরটা এর কাছে। টাকা, আনা, পাই-পয়সা। চা-বিড়ি-খোরাক। সেই সূর্য না ওঠা থেকে নিঝুম রাত পর্যন্ত, প্রতিটি পয়সার টায়টিকে হিসাব। প্যাসেঞ্জারের আদব কায়দা, দরাদরি। কে বে-দিল আর দিলদার। কার প্যাসেঞ্জার কে নিয়েছে ছিনিয়ে। লাইনের কত পেছনে ভাজা পড়েছিল। অর্থাৎ স্টেশনের গেটের কাছ থেকে সারি সারি কতগুলি রিকশার পেছনে ছিল সে। যেন একপাশে তাগাড় করে জমিয়ে রাখা ছিল কথাগুলি। এখন হুড়মুড় পড়তে লাগল।

অথচ মালিকের কাছে স্রেফ বেইমান। সারাদিন হেঁকেছে, যাত্রীও টেনেছে। চার পয়সার দারু কিংবা দু'পয়সার কিসমতবাজী করেনি কেউ। অর্থাৎ জুয়া খেলেনি। চার গেলাস কিংবা আট গেলাস, হয়তো তারো বেশি বারো গেলাস চা খেয়ে ফেলেছে। মাইরি, কি করে যে খাওয়া হয়ে যায়। বাড়ির ভাতে পেট ভরে না। হাতে পয়সা, চোখের সামনে প্রচুর খাবার। খিদে পেলে কি করা যায়। ওইরকম গরম ফুলুরি চপ্। কতক্ষণ থাকা যায়। তা ও কি আর, বল! খেয়েও বদনের রং বদলায় না মাইরি।

কেউ ঘর খরচা দিয়েছে, কেউ দেয়নি। মনিবের রোজকারটা দিতে পারলে রক্ষে। বাকি পড়লে বুক কাঁপে খালি। যেন এ-জীবনে আর শোধ হতে চায় না। আর রোজ খিঁচুনি। রোজ তো সমান নয়। একদিন ন্যাড়া নাচে, আর একদিন গোবিন্দ আছে। কপাল! প্যাসেঞ্জার তো ভগবান! কাকে যে কখন মনে ধরে যায়। আর এত রিকশা। একজন যাত্রীকে দশজন ধরে টানাটানি করে। কে কাকে ঠকাবে। ট্যাঁক তো ফাঁকি। সবাই সবার ট্যাঁক পকেট উলটে পালটে দেখায়। কাল ভোরে গাড়ি নিয়ে না বেরুলে, দাঁতে কুটো কাটা চলবে না।

সকলের সব কথা বলা হয়ে গেলে, হঠাৎ স্তব্ধ হয় জটলা। রাস্তার আলোগুলি হা করে চেয়ে থাকে। যেন বলছে, হয়ে গেল? ফাঁক পেয়ে উত্তুরে হাওয়াটা ছপ্‌টি হাঁকে, চল্ চল্ চল্।

প্রত্যহের জটলা। প্রত্যহের কথা। প্রত্যহের মতো কোন্-পথে গোঁফ-জোড়া টেনে একটু আড় ভেঙে বলে, 'কোই বিশওয়াস না করে। না মালিক, না হুনিয়া।'

আজীব হুনিয়া বলে, 'ঘরের বউও করে না।'

উদয়ের পথে ছোকরা একটা কটূক্তি করে বলে, 'বাইরের বউ-ই করে না। গলি দিয়ে গেলে ডাকবে। যদি বলি শালা পয়সা নেই, পকেটে হাত দিয়ে দেখবে।'

তারপর হাসি। কিন্তু আবার, 'মগর আদমিটা খুব ভালো। সচ্, ইনকলাবি।'

অর্থাৎ রতনলাল।

উদয়ের পথে কপালের চুলগুলি তুলে দেয় মাথার ঝাঁকানি দিয়ে। বলে, 'আরে সে তুমি কি বলবে?' আমি 'জানিনে? হুবে এঞ্জিনারিংএর পাশ্ দিয়ে গেলে শালা কারখানার লোক গন্ধ পায় রতনবাবু যাচ্ছে। দিনরাত শালা টিকটিকি ঘুরছে লোকটার পেছনে।'

'নিজে দেখেছি, জানিস্। পুলিশ ইস্তক ভয় পায়। এ তো আর বাবু-স্বদেশী নয়।' সকলের ঘাড়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আজীবহুনিয়া ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'আর আমি তো শুনেছি রতনবাবুর অসাধ্য কাজ কিছু নেই।'

'জেলে নাকি খুব মার মেরেছিল। মানে, ওই যে বলে না বিপ্‌লাব; ওই বিপ্‌লাবের মধ্যে কে কে আছে নাম জানবার জন্যে খুব মেরেছিল। বাট্ শালা ইস্পকটি নট্। উঁহুঁ। খোদ রতনবাবু বলেছে।'

কোন্ পথে চাপড় কষাল একটা আজীবহুনিয়ার ঘাড়ে।—'জানতে হ্যায়, খুব জানতে হ্যায়। তু বল্‌বে, তব্ জানবে? টিন্দলের

সিপাইটা শালা কট্‌মট্‌ করে হামাকে দেখে আর বোলে, 'হুঁ, নাম্‌তা সাইকিল ইস্টোর কি গাড়ি চালাচ্ছে? তুমাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হোবে। শালা তেরি…'

'তবে বড় রগচটা।' উদয়ের পথে ছোকরা বলে, 'আমাকে তো শালা একদিন রেঞ্চু ছুঁড়েই মারলে, মনে আছে?'

আজীব ছুনিয়া বললে, 'কেন, একবার আমার কাপড় খুলে দিল মেরে। শালা একেবারে ল্যাংটা।'

কোন্‌পথে করুণ স্বরে বলে, 'হামার মোচ্‌ তো কেতোদিন টেনে টেনে একদম উখাড় দিয়েছে। তব্‌ হাঁ, সাচ্চা আদমির দিমাক জায়দা গরম হয়।'

'হাঁ, ঠিক', এক কথায় সায় দেয় সবাই। তবে? এরকম একটা সাচ্চা লোককে তারা ঠকাবে?

তারপরে হঠাৎ সকলের নজর পড়ে এগিয়ে চলর ওপর। সে আজ প্রথম থেকেই নীরব। কেবল গানের সময় তবলা বাজিয়েছিল মুখে। নজর পড়তেই মনে হল, সে আজ সাড়ে তিনটাকা বকেয়া আর রোজের একটাকা দিয়েছে।

আজীবছুনিয়া বলে, 'কিরে, তোর মুখে যে কথা নেই? কত কামিয়েছিস্‌ আজ?' এগিয়ে চল ছুই উরুতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কুঁজো হয়ে ছিল। বলল, 'মালিক সাড়ে চার, ঘর খরচা দেড়, ছ ইধার উধার খরচা এক, সাত। এখন পাকিট ফাঁক।'

সাত টাকা। কিন্তু কেউ হেসে উঠল না, কথা বলল না। একদিনে সাত টাকা রোজগার হলে কথা বলা যায় না, তারা জানে। কেবল উদয়ের পথে বলল, 'চল, তোর গা হাত পা একটু বানিয়ে দিই।'

ঘাড় নেড়ে বলল সে, 'নাঃ। একটু মাল না হলে হাত পা ছাড়বে না। শালা, সব ছোট হয়ে গেছে মাইরি। শরীলটা বিলকুল…'

হঠাৎ সকলেই কেমন কুঁকড়ে যায়। সত্যি, শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিদিন একটু একটু করে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তবু

উদয়ের পথে তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। বলল, 'হ্যাঁ, মালের দোকান তোর জন্যে এখন খুলে রেখেছে।'

কোন্ পথে বুড়ো হেসে বলল, 'দোকানটা থোড়া শুঁকে যা, জাম্ ছাড়বে।'

আজীবত্নিয়া বলল, 'সিরেফ্ বিপ্লাব। বিপ্লাব করে দিতে হবে। নইলে ছোট হতে হতে আজীবত্নিয়া একেবারে পিঁপড়ে হয়ে যাবে।'

কথায় শেষে কোন্ পথে বুড়ো মুখে হাত চাপা দিল। আর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সুর করে বাজিয়ে দিল একটা চেনা গানের কলি।

এও প্রত্যহের। সবই প্রত্যহের। সাইকেল রিকশার তিনটে চাকার মতো। তিনটে এক সঙ্গে ঘোরে। একরকম ঘোরে।

রতন রোজই থুক্ থুক্ করে। কোনো কোনো দিন পয়সার শোকে পাগল হয়ে ওঠে। শুরু করে দেয় ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি। নইলে রিকশার ব্যবসা করা চলে না বোধহয়।

তারপরেই সে তার মুখের আর একটা ঢাকনা দেয় খুলে। পায়চারি করে, দাঁড়ায়, বুক টান করে। কখনো চিবিয়ে চিবিয়ে, কখনো কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে, হাত তুলে বলে, 'ওই ছ্যাখ্ সামনে কী দিন। রক্তরাঙা দিন। খাঁটি মজদুর যেদিন লড়াইয়ে নামবে সে হাজার বছরের শোধ তুলে ছেড়ে দেবে, হাঁ। ফৌজী কায়দায়, হাঁ হাঁ মজদুর ফৌজ হয়ে যাবে।'

বলেই বন্দুক বাগিয়ে ধরার কায়দায় হাত তুলে বলে, 'এমনি, এমনি করে করে গুড়ুম গুম্ সট্ সট্ খতম করে দিয়ে যাবে। যাকে বলে বুর্জুয়া, সেই তাদের একদম ফোড় করে ছেড়ে দেবে।'

বলতে বলতে হাত পায়ের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে রতনের। চোখ ছুটো জ্বলে ধ্বক্ধ্বক্ করে। বলে, 'কেন? না, মালিক তাদের রক্ত শুষে খেয়েছে। দিনের পর দিন ঠকিয়েছে। এবার লড়াই। হাঁ, পথে পথে খুনের দরিয়া বয়ে যাবে। কী ভয়ঙ্কর সে দিন।'

যেন সেই ভয়ঙ্করতা চেপে বসে রতনের মুখে। চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, 'সে কি এমনি হয়? একাই চাই। যাকে বলে একতা। বুর্জুয়া কি করে? না, মজত্বরকে ফারাক করে দেয়। লড়িয়ে দেয় নিজেদের মধ্যে। মানে? জানোয়ার করে দেয়। তাহলে হবে না। মালিকের চালাকি ধরতে হবে, দিমাক চাই। সব জানি আমি, সব জানি। কি ভাবে ঠকাচ্ছে, ধরতে হবে। যেমন মুদী ঠকায় খদ্দেরকে, খদ্দের ঘ্যাঁচ্‌ করে ধরে, সেইরকম। যেমন ঠকায় আগরওয়ালা ওর রিকশাওয়ালাদের। একশোটা রিকশার মালিক হয়েছে ও সবাইকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে। এসব বলতে হবে, বোঝাতে হবে সবাইকে। তারপর ময়দানে নামতে হবে। বিপ্লব এমনি হয় না। জেলে যেতে হবে, ফাঁসি যেতে হবে,...'

তার গলা যত চড়ে, শ্রোতাদের চোখগুলি তত বড় হয়ে ওঠে। নমিতা সাইকেল ওয়ার্কসের বেড়ায় কাঁপতে থাকে তাদের ছায়াগুলি।

রতন ঝাঁপ-খোলা সামনের রাস্তাটা দেখিয়ে বলে, 'এই রাস্তাটা একদিন লড়াইয়ের ময়দান হয়ে যাবে। আর যে সাচ্চা নয়, খাঁটি নয়, সে শালা মওগার মতো পড়ে থাকবে বন্ধ ঘরে। দেখিস্‌। এই আমরা, আমরা বিপ্লব করে মরব। মজত্বর বিপ্লব চায়। বিপ্লব মানে কি? যে খেটে খায়, তার তুনিয়াদারি।'

শুধু চারজন রিকশাওয়ালা নয়। সারাদিনে অনেকে আসে রতনের কাছে। তার মধ্যে কয়েকজন তার ভক্ত আছে। কারখানার লোকও তু'একজন আসে তার কাছে। সারাদিনের মধ্যে কতবার যে সে বিপ্লবের পথ দেখায়।

নিজের গলায় এই প্রত্যেকটি শব্দ ও সুর তাকে যেন মাতাল করে ফেলে। বৈষ্ণবের শ্যাম নামের মতো মর্মে মর্মে পশে। আর বিচিত্র এক আমেজ ও উদ্দীপনায় সে কাঁপে। চোখ বোজে, হাসে, দাঁত কড়্‌মড়্‌ করে।

পাশাপাশি কিংবা দল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আজীবত্নিয়া, এগিয়ে চল, কোন্ পথে আর উদয়ের পথে। এত কথার মানেই বোঝে না তারা। কেবল বিশেষ এক একটা শব্দ নিয়ে ঠোঁট নাড়ে। আর সত্যি, তাদের বুকের মধ্যে কোথায় যেন জ্বলে ধিকি ধিকি। একটা অস্পষ্ট আবছা দৃশ্য ভাসে চোখের সামনে। দুর্বোধ্য এক হল্লা আর ভিড়ের দৃশ্য, যে ভিড়ের মধ্যে তারাও হা করে দাঁড়িয়ে আছে।

আর সারাদিনের মধ্যে যখন কেবল ঘটাং করে খোলে পাকা দরজা, উঁকি দেয় একটি মুখ, তীরের মতো এসে বেঁধে তীব্র গলার মুখ ঝামটা, তখন বড় ব্যথিত অবসাদগ্রস্ত মনে হয় রতনকে। এমনকি শ্রোতাদেরও।

আর একজন আছে। এক বুড়ো। সেও দুবে ইঞ্জিনিয়ারিংএর মিস্তিরি ছিল। মালিক তাকে বের করে দিয়েছে কারখানা থেকে। সে নাকি রতনের চেয়েও খারাপ মানুষ। মজুরদের নাকি সে লড়বার পরামর্শ দেয়। কিন্তু কথা সে কম বলে। সে আসে মাঝে মাঝে, রতনের কথা শোনে। গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে বুড়ো হাসে। আর রতন তার দিকে ঘৃণা ভরে তাকিয়ে থাকে। বুড়ো যেন তার চেয়েও বড় হতে চায়।

তারপর মধ্যরাত্রে ওই চারটে ঘেসো জোঁকের দলকে রতন শোষণের অর্থ বোঝায়। বোঝায়, তাদের সঙ্গে খাঁটি মজদুরের কি তফাত, যে মজদুর ইনকিলাব করবে।

যেন একটা খেলা। সবাই যেন একটা খেলা নিয়ে মেতে আছে। এর পরে এই, তারপরে এই। শেষ রেশটা থাকে শুধু রতনের গলার। কিন্তু একদিন হঠাৎ গণ্ডগোল হয়ে গেল। গণ্ডগোল করে দিল উদয়ের পথে ছোকরা। যার কয়েকটা ভাই ছাড়া, আর ছিল মা। সেই মায়ের অসুখ। সারাদিন রিকশা চালিয়ে পয়সাটা চলে গেল ডাক্তারের হাতে। সেদিন আর সে নমিতা সাইকেল স্টোর-মুখো হল না। ভাবল, পরের দিন দিয়ে দেবে।

পরের দিনও হল না। পয়সা সব শেষ। একবার না যাওয়ার আতঙ্ক কায়েমী হয়ে বসেছে। এদিকে মায়ের অসুখ। যেন যম ছাড়ে না গোছের। রোজ রোজ এক কাড়ি করে পয়সা। খাটনির ওপরে আবার ধার। একদিন, দুদিন, তিনদিন। রতন তো পাগল। খবর নিয়েছে সবকিছু। অপেক্ষা করে আছে। একবার এলে হয়। তিনদিন চারদিন পাঁচদিন। মধ্যরাত্রে রতনের চিৎকার শোনা যায়, 'চোট্টা, তোরা চোট্টার দল। ইনকিলাব করবি তোরা? আসুক সে শালা।'

এল রতনের সেই শালা, আটদিন পর। শ্মশানে মাকে পুড়িয়ে, সন্ধ্যাবেলা তিন দফা সোয়ারি টেনে হাজির। তা-ও ভয়ে ভয়ে, সকলের আগে এসেছে।

রতনের হাতের সামনে ছিল একটা পুরানো টায়ার। সেইটা দিয়েই এক ঘা কষাল সে উদয়ের পথের ঘাড়ে। খেঁকিয়ে উঠল, 'শালা, তোকে আবার আমি দিয়েছি উদয়ের পথে চালাতে? মানে জানিস্ শালা? গাড়ির নামের বে-ইজ্জত! উদয়ের পথে যাবি তুই? চোট্টা রিকশাওয়ালা? সব শালা চোট্টা! নিকাল্ যা।' বলে আরো কয়েক ঘা দিয়ে বার করে দিল। বলল, 'পয়সা নেই, আবার গাড়িও গ্যারেজে নেই? নিকালো, বকেয়া মিটিয়ে যাবি শালা দুদিনের মধ্যে। গাড়ি আর তোকে কোন্ শালা দেয় দেখি।'

উদয়ের পথে কিছু বলল না। কাঁদল না, চেঁচাল না। গালে হাত দিয়ে বসে রইল রাস্তার অন্যধারে একটা ভাঙা বাড়ির বারান্দায়।

ভোর হল। বেলা হল। রতন দেখল, কারুর পাত্তা নেই। উঁকি দিয়ে দেখল, ভাঙা বাড়ির বারান্দায় সব বসে আছে। পাশাপাশি চারজন, কুকুরের মতো পিট্‌পিট্ করে দেখছে। রতনের মাথার চুল যেন একবার খাড়া হল, আবার নামল। মনে মনে খেঁকিয়ে উঠল, 'কি ব্যাপার! শালারা আসবে না নাকি?'

কাছে গিয়ে বলল, 'তোরা তিনজন গাড়ি বার করবি না ?'

মাথা তোলে না কেউ। আড়ে আড়ে দেখে। তারপর এগিয়ে চল বলে ফেলে, 'না।'

'কেন ?'

আজীবহুনিয়া বলল, 'ঝুটমুট তুমি মারলে ছোঁড়াটাকে।'

কোন্ পথে বলল, 'ছোক্‌রাটার মা মর্ গেল। তুম্ পিটা দিয়া।'

রতনের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। বলল, 'তবে কি করতে হবে ?'

'উস্‌কে গাড়ি চালাতে দিতে হবে। অওর...'

এগিয়ে চল বলল, 'আর এই আট রোজ মকুব।'

'হ্যাঁ শুধু শুধু মারলে। তার একটা ইয়ে আছে তো ? আমাদের তো মকুব চাইছিনে ?' গম্ভীর গলায় থেমে থেমে বলল আজীবহুনিয়া।

রতন প্রায় একটা পাক খেয়ে নিল। অর্থাৎ ফিরে যাবে মনে করেছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ল। তার লোমহীন ভ্রূজোড়া প্রায় খোঁচা খোঁচা চুলে গিয়ে ঠেকেছে। রেগে চমকে উঠে বলল, 'ওরে! ওরে শালা! স্ট্রাইক! আমার বিরুদ্ধে? আমাকে বিপ্লব দেখাচ্ছিস্ শালারা ? তোরা, তোরা !' খতিয়ে গেল রতনের গলা।

আজীবহুনিয়া মোটা গলায় বোকাটেভাবে বলল, 'এই ছাখো। বিপ্‌লাব আবার কি করলুম।'

'মানে একটা ল্যায্য বিচার করতে হবে তো। তা এইটে আমাদের মনে নিল।'

রতন বলে উঠল, 'থুক থুক। তোরা লড়িয়ে মজুরের নকল করছিস্। তোরা বেইমান, চোট্টা, আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস্। আমি রতনলাল পাঠক, মজহুর আমাকে চেনে। আমার বিরুদ্ধে স্ট্রাইক ?'

আজীবহুনিয়া আবার বলল, 'ইস্‌টারেক কেন ?' একটা—'

'চোপ !' ফিরে গেল রতন। আবার এল তাঁতের মাকুর মতো ফিরে, 'দেখবি তোরা সত্যিকারের লড়াইয়ের দিন! ইন্‌কিলাব কাকে বলে। মর্ শালারা না খেয়ে।'

'তা আমরা কি বলছি…' আজীবছুনিয়ার কথার ফাঁকেই চলে গেল রতন। চোখ পড়ল সামনের ধোপাখানার দিকে। সেখানে বসে আছে সেই বুড়ো মিস্তিরিটা। গোঁফের ফাঁকে হাসছে বসে বসে।

'শালা!' রতনলাল ঘরে ঢুকে, দেখিয়ে দেখিয়ে চারটে রিকশার চেইন তালা দিয়ে আঁটল। তারপর ঝাঁপ বন্ধ করে দিল।

একদিন, তুদিন, চারদিন। ওরা চারজন যেন এই বারান্দাটায় মৌরসীপাট্টা গেড়েছে। কখনো সখনো এদিক ওদিক যায়। বোধহয় দোকানে দোকানে ঘোরে কিছু ধারের খাবারের জন্য। ভোর হলে ঠিক ওইখানটিতে এসেই বসে। উপোসের ছাপ পড়ছে মুখে। শুকিয়ে চাম্‌সি হচ্ছে চেহারাগুলি।

নমিতা সাইকেল ওয়ার্কসের বেড়ার ফোকর দিয়ে তাদের কেউ দেখে কিনা তারা জানেনা। কিন্তু দেখে একজন। রতন দেখে আর ফোলে। ছুটে ঘরে গিয়ে বউকে বলে, 'আমাকে লড়াই দেখাচ্ছে? জানো সেদিন কি হবে? যেদিন নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণী যুগযুগান্তের অত্যাচারের…'

বউ হল তার পাকা ঘরের দরজার সেই মুখ। নমিতা তার নাম। পাঁচ দিনের দিন সে বলে বসল, 'কথা হবে পরে। সংসার চালাও আগে। এদিকে যে ফাঁক।'

ফাঁক! বেরুল রতন বাইরে। এদিক সেদিক ঘুরে দেখা করল কয়েক জনের সঙ্গে। যারা বেকার বসে আছে অথচ রিকশা চালাতে পারে। সবাই এক কথা বলে, 'তা কি করে হয়। একই কাজ। চারটে লোককে মেরে কি খাওয়া যায়?'

প্রায় হকচকিয়ে ওঠে রতন। একতা? এর নাম একতা? যারা বকেয়া মেটায় না. রোজকারটা পর্যন্ত পুরো দেয় না, উপরন্তু গাড়ি ঘায়েল করে, সেই সব নেমকহারামের একতা! আরে ছোঃ ছোঃ!

ভাবে, কী বীভৎস আর কুৎসিত এদের লড়াইয়ের কায়দা। রতনের মতো একটা মানুষকেও যারা ঠকায়।

আর এদের সামনে সে কিনা মজতুর লড়াইয়ের কথা বলে আসছে। কি বিরাট অপরূপ রূপ সেই যুদ্ধের! আকাশে বাতাসে, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় দিগ্‌-দিগন্ত আলোড়িত হয়ে উঠবে সে বিপ্লবের কলকল তানে।

চারিদিনের পর আট দিন। তারপর বারোদিন। নমিতার কাছে কিছু বলতে গেলে থমকে যায় রতন। মনে হয় গলায় আটকে গেছে বেড়ালছানা। মিউ মিউ করে, আর আঁচড়ায়। সে বলতে চায়, এটা আসল রূপ নয়। আসল রূপ অন্যরকম। এ হচ্ছে নকল শয়তানের কারসাজি।

কিন্তু ঝিমিয়ে পড়ছে রতন। এই করে সে খায়! চারটে লোক তাকে খাওয়ায়। তার ছেলেপুলে, মা-বউ। শেষে নমিতাও বিদ্রোহ করে বসে। বলে, 'আজে বাজে বকে ঘরের লক্ষ্মী দূর করছ তুমি? আমার ঘরের লক্ষ্মী।'···

ঘরের লক্ষ্মী! কে তার ঘরের লক্ষ্মী! যেন নমিতা সাইকেল ওয়ার্কসটা শুদ্ধ তাকে চেপে ধরতে আসছে। এমনকি, খাওয়ায়ও কম পড়ছে যেন।. তার পেটে খিদে। একে একে ঘরের সকলের পেটে খিদে। খিদে, খিদে!

সন্ধ্যার ঝোঁকে রাস্তায় এসে দাঁড়াল রতন। শীত গেছে। বাতাসে ধুলো উড়ছে। সন্ধ্যার কালো আঁধারে ঝাপসা দেখাচ্ছে সবকিছু। রতন আগে দেখল ধোপাখানার দিকে। বুড়ো মিস্তিরিটা আছে কিনা। দেখা যাচ্ছে না কাউকে।

সে ভাঙা বাড়ির বারান্দাটার দিকে তাকাল। সারা শীতকালটা ওখানে কয়েকটা কুকুর গায়ে গায়ে পড়ে থাকে। এখনও সেইরকম দেখাচ্ছে। এই অসৎ খুদে জোঁকগুলিকে মজতুর-রাজ বোঝাত সে। ছি!

তবু সে পায়ে পায়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল ছায়ার মতো। সে একটি ছায়া, আরো চারটি ছায়া নড়েচড়ে উঠল। ভেতরে ঢোকা চোখগুলি তাদের চক্‌চক্‌ করছে।

রতন দাঁড়াল সোজা হয়ে, বুক টান করে। চাপা গলায় বলল, 'নিপীড়িত শ্রমিকের আন্দোলন তোরা কোনদিন বুঝবি না। সেই ইনাকিলাবের ডাক যেদিন আসবে…'

গলাটা আটকে গেল। কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর হঠাৎ রতন তীব্র ঝাঁজ দিয়ে বলে উঠল, 'মকুব।'

বলেই সে দরজার দিকে এগুল। চারটে ছায়াও তার পেছন পেছন এল। রতন দরজা খুলে এক গোছা চাবি ছুঁড়ে ফেলে দিল। চারজনে মিলে চেনের তালা খুলে গাড়ি বার করতে গেল।

রতন বলল, 'এখুনি?'

চারটে গলা শোনা গেল একসঙ্গে, 'তা ছাড়া? আজকে খেতে হবে তো।'

বেরিয়ে গেল 'আজীবহুনিয়া' ধুঁকতে ধুঁকতে। তার পেছনে ধুঁকতে ধুঁকতে 'এগিয়ে চল' 'কোন পথে?' 'উদয়ের পথে'। তবু একবার কেঁপে কেঁপে ঠোঁট-গিটারের সুর, তবলার বুংবুং। রতন বুকটা টান করে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। চমকে তাকিয়ে দেখল,সামনে সেই বুড়ো মিস্তিরি। সে সত্যি হাসে না। মুখটাই তার অমনি। গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে হাসির ভাব।

চোখাচোখি হতেই রতন বলল, 'বেরিয়ে যা তুই বুড়ো এখান থেকে।'

বুড়ো এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে এবার সত্যি হেসে ফেলল। বলল, 'খালি বাত্। শালা ফটিচার! দেখে লে, কারা একদিন হুনিয়া বিগড়ে দেবে।' সে বেরিয়ে গেল।

সামনের রাস্তাটা হাওয়ায় যেন ছুটতে লাগল দূব দূরান্তে।

নিমাইয়ের দেশত্যাগ

এ যেন সেই বন্যার জলে ভেসে-যাওয়া খড়কুটোর মত। কোথায় ঠেকে কোথায় পড়ে, হেজে পচে যায় তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

গাঁ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে সবাই যায়। নিমাইও যায়। থাকবে কার কাছে। জ্ঞান হয়ে শুনেছে মা মরে গেছে তার। বাপের কাছে মায়ের গল্প শুনত নিমাই। লোকে আবার তার বাপকে ভাল বলত না। বাপ নাকি তার মনিষ্যি নয়। ভিটে নেই, মাটি নেই। গোষ্ঠ কামারদের হাপর-ঘরের পাশে খড়েব ছাউনি দিয়ে নিমাইকে নিয়ে তার বাপ থাকত। বেতের ধামা, সাজি, এ সব বুনত, গড়ত। সেই বেচেই দিন চালাত। তাও কি সে পয়সাতে বাপ-ব্যাটার চলতে পারে? পারে না। সময়ে অসময়ে নিমাইকে তাই হাপরে কাজ করতে হত, কামারদের ফাই-ফরমায়েস খেটে ছোট্টবেলাটি থেকে পেটের ধান্দায় থাকতে হয়েছে নিমাইকে।

তারপরে সেই বাপই একদিন উধাও হল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার দিন কাটাকাটি খুনোখুনি, লুটপাট। কে কোথায় যায়, ঠিক নেই তার কিছু। বেজেরহাটির বাজার যেদিন লুট হয়ে গেল, নিমগাঁয়ের কাক-পক্ষীও সেদিন পালাতে লাগল। বাপ তার পালিয়ে গেল। সবাই পালাচ্ছে। নিমাইকে ডেকেও কেউ জিজ্ঞেস করে না কিছু। যে ছেলেকে বাপই দুটো কথা বলল না, তাকে ডেকে কথা বলবে লোকে!

সবার আড়ালে গিয়ে নিমাই খুব খানিক কাঁদল, আর তার পায়ের কাছে বসে হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কামার বাড়ির কুকুর ভোলা। ওর-ও কেউ নেই যে!

কেউ আসাম, কেউ কুচবিহার, কেউ কইলকাত্তা।

কামাররা হাপর হাতুড়ি নিয়ে ঘর ছাড়ল। নিমাই আর ভোলা উঠানে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিদায় দিল।···কিন্তু নিমাইকে খেতে দেবে কে? নিমর্গা আর তাদের দেশ নয়, দেশ নাকি কইলকাত্তাঁ। ইস্, কইলকাত্তাই নিজের দেশ! কয় কি!

কামারবাড়ির বুড়ো কর্তা আর বুড়ী গিন্নী ঘর আগলে পড়ে রইল। নিমাই বাঁধল তার ছোট্ট পুঁটলি। জামা একখানা, পাঁচ হাত ধুতি একখানা, একটা লাল-নীল পেন্সিল, নিব, কয়েকটা শিশি, ভক্ত-প্রহ্লাদ বই, এমনি সব নানানখানা।

পুঁটলি বেঁধে তার উপর মুখ রেখে নিমাই কেঁদে উঠল। কোথায় যাবে সে! কইলকাত্তা! এ দেশ আর তাদের নয়। পুঁটলি বগলে বুড়ো কামারের কাছে এসে দাঁড়াল।—কর্তা, আমি যাইগা।

কর্তারও তো বড় সাধ নয় অমন করে দুধের শিশু গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু কোন উপায় তো নেই। দু'মুঠো ভাত আজ আর ঘরে নেই কর্তার। তা ছাড়া, ওই ছেলেকে যদি ডাকাতরা কেটেই ফেলে, তার জবাবদিহি করবে কে? এ দেশকে যে আর বিশ্বাস করা যায় না। জিজ্ঞেস করল : কই যাইবা গো?

কইলকাত্তা।

কইলকাত্তা? খাইবা কি বাসী সেই শহর বিছাশে?

এত লোক যায়, খায় কি?

হঠাৎ কিছু জবাব দিতে পারল না কর্তা। সত্যি, এত লোক যায়, খায় কি? আর সে দেশ সম্পর্কে বুড়ো কিছু জানেও না। নিজের মহকুমাটি ছেড়ে তো সে তার জীবনে কোথাও বেরোয়নি। বলল : তবে আস গিয়া।

বলতে বলতে বুড়ো কর্তার চোখে জল এল। মা-মরা, হতভাগ্য বাপের ছেলেটা যে তারই ভিটেয় থেকে এতবড়টি হয়েছে। দেশের মাটি যাকে রাখল না, তার কি ক্ষমতা আছে নিমাইকে রাখে।

সবাই ছাড়ে, ভোলা তো ছাড়ে না নিমাইকে। পথ আগলে দাঁড়ায় আর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে কোলের উপর। শেষটায়

ভোলার গলা জড়িয়ে ধরে নিমাই বলল ঃ মিছা কথা ভোলা, কইলকাত্তা আমাগো দেশ না। নিমগাঁও আমাগো দেশ। হাঙ্গামা যাউক, ফিরে আসুম। তোর লেইগ্যা একখান চামড়ার বেল্‌ট্ লইয়া আসুম, হ।

কিন্তু তাতে এ দু'বন্ধুর চোখের জল বাধা মানল না!

নীরব গ্রাম। হতাশায়, বেদনায় সব যেন কান্নায় কেমন ঝিম্ ধরে আছে। বুঝি গ্রামে মানুষ নেই। ভাল মানুষ শরাফৎ শেখ, পরের মাঠে লাঙ্গল চালিয়ে খায়। নিমাইকে পুঁটলি নিয়ে যেতে দেখে হুতোশে ছুটে আসে মাঠ থেকে পথে। জিজ্ঞেস করে ঃ কই যাও বাপজান, তুমি কই যাও?

হ, এমন মানুষ যদি সবাই হত! এই শরাফৎ শেখের মত। বাপের মত পরমাত্মীয় শেখ, নিমাইকে বড় ভালবাসে। চোখ মুছে নিমাই বলল ঃ কইলকাত্তা।

হ। এতবড় হয়ে ওঠে শেখের চোখ। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। সে তো রাখতে পারবে না নিমাইকে।

বড় বিলের ধার দিয়ে কয়েকটী পরিবার লটবহর নিয়ে চলেছে। শিশু, বৃদ্ধ, মেয়ে পুরুষ। গ্রাম-ছাড়া, ভিটে-ছাড়ার দল।

শেখ বলে নিমাইয়ের গাল টিপে ঃ আমার ব্যাটা, তোমার দোস্ত, মন্নুর লগে দেখা করবা না বাপ?

শেখের আদর পেয়ে বুকটার মধ্যে মুচড়ে ওঠে নিমাইয়ের। এই শেখ বুড়ো কর্তা, মন্নু, রোশনারা, আন্না—এদের সবাইকে ছেড়ে কোথায় চলেছে সে! কোথায়! সে দেশ কেমন। ভয় হয়, কান্না পায়।

বিলধারের দলটার পড়ি-মরি করে ছোটা দেখে নিমাই বলে ওঠে ঃ যাইগা শরাফৎ কাকা!

শেখ নিমাইয়ের চিবুকটি ধরে গুণগুণ করে গেয়ে ওঠে ঃ

মা গো কহিতে পরাণ যায়
মুখে নাহি বাহিরায়,

সোনার ন'দে আঁধার করে
নিমাইচান্দ্ চলে যায়।

হ, তুমি আমাগো নিমাই !

হাহাকার করে ওঠে নিমাইয়ের বুকটার মধ্যে। মা, মা গো !

শেখের দিকে পিছন ফিরে তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করে সে। চোখের জলে ঝাপসা গ্রামখানি তরতর করে কাঁপতে লাগল তার চোখের সামনে। মা, মা গো ! চোখে না-দেখা মায়ের জন্য মন পাগল হয়ে ওঠে নিমাইয়ের। গাঁয়ের ধাবে ননী সাহার গোলাবাড়ি শূন্য পড়ে আছে। তাবা নেই। এব পূব ভিটের ঘরখানিই ছিল নিমাইদের ভিটে। সেই ঘরেই জন্মেছিল সে। আম-কাঁঠালের ছায়াঘেরা বেড়াভাঙা ঘব।

ভাঙা বেড়ায় হাত রেখে নিমাই ডাকল মা, মা !

মায়ের নিঃশ্বাসেব মত বাতাস ঝরে পড়ে নিমাইয়ের মাথায়। ছাতা-পড়া, মাকড়সার জালে ভবা তল্‌তা বাঁশের বেড়ায় চোখের জল পড়ে। নিমাই বলে : আমি দেশান্তরী অইলাম, দুঃখ কইরো না মা।

তারপব সে এক যুদ্ধ। পথে পথে বাসে, রেলে, স্টিমারে পুলিশের লোক, কাষ্টম্‌সেব লোক, টিকিটবাবু। সে এক এলাহি কাণ্ড। এব বাক্‌স ধরে টান দেয়, ওর প্যাঁট্‌রা ধরে। এর হাত ধরে তো ওব ঘাড় ধরে।

দেশেব মানুষ যায়, তার সঙ্গে দেশের সম্পদও যায়। যুদ্ধ করে রাজায় রাজায়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। গবীব মানুষেব হাঁড়িকুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কি আপদ ! আইন বড় দড়। নিমাইয়েব পুঁটলিটাও খুলে ছড়িয়ে কাষ্টম্‌সের লোকেরা দেখল।

রাত আর পোহায় না। গাড়ি চলেছে তো চলেইছে। নিমাই কেবলই একে ওকে জিজ্ঞেস করে, কইলকাত্তা আইল ?

শুনে শুনে সবার ব্যাজার লাগে। বলে, থামরে বাপু। কইলকাত্তা কি হাতের কাছে ?

কিন্তু নিমাই তো আর এতশত জানে না। তার ভয় কলকাতা বুঝি পেরিয়ে যাবে গাড়ি।

এক জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড়াতে অনেক লোককে নামতে দেখে নিমাইয়ের তর সইল না। সেও নেমে পড়ল। তখন সবে সূর্য দেখা দিয়েছে পূব আকাশে।

এইটা কইলকাত্তা? সবাইকে জিজ্ঞেস করে সে। যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। জবাব দেবে কে?

একজন বলল ঃ আরে দূর বোকা। এইটা তো নৈহাটী।

কোনকালেও এমন নাম শোনেনি সে। নৈহাটী! এখানে কার কাছে কোথায় যাবে সে? প্ল্যাটফর্মের উপর হাঁড়িকুড়ি, বিছানা-পত্র ছড়িয়ে-বসা লোকগুলো দেখলেই সে চিনতে পারে, এরা তার দেশেরই লোক। কিন্তু ডেকে কেউ কথাটিও বলে না।··সে-ই সবার কাছে যায়, ফন্দিফকির জিজ্ঞেস করে।

কেউ বলে, কাজ খোঁজ। বাড়ির চাকর, দোকানের চাকর। না হয়ত ভিক্ষা।

ভিক্ষা! ক্যান? .বড় মুষড়ে পড়ে নিমাই। কই, এ দেশ যে খারাপ, অতো তারে কেউ বলেনি। সে শুধু শুনেছে, এ দেশে এলে বিপদ কাটবে এখানে এলেই সব বাঁচবে। কিন্তু কেমন করে?

পথে পথে ঘোরে নিমাই। যাকে-তাকে ধরে জিজ্ঞেস করে ঃ চাকর নিবেন কর্তা, আমারে নেন।

পথচারী মানুষ অবাক হয়, বিরক্ত হয়, হাসে। বলে, না রে বাপু, নিজেরাই খেতে পাই না!

হ, কয় কি? নিমাইও অবাক মানে। সম্বল কয়েকটি পয়সা একটি দিনেই শেষ হয়ে গেল।

স্টেশনের সামনে ঝকঝকে হাওয়া-গাড়িতে সুন্দর সুন্দর মানুষ দেখে নিমাই এগিয়ে যায়—চাকর নিবেন বাবু? মা গো, চাকর নেন আমারে! বাসন মাজুম, কাপড় ধুমু ছোট ছাওয়াল কোলে রাখুম।

ড্রাইভার গাল দিয়ে ওঠে, নিকালো শুয়ার।

শুয়ার ! হতবাক নিমাই। গালি দেয় কেন ?

দোকানে দোকানে ঘোরে সে। নিজের কথা বলে, খাটতে পারি, যে কাম কইবেন, স—ব রকম। ফাঁকি দিমু না। দুই মুঠা খাইতে দিয়েন।

সবাই হাত নেড়ে মাথা নেড়ে ফিরিয়ে দেয়।

দক্ষিণের বড় সড়ক ধরে এগিয়ে চলে নিমাই। পথের ধারে বড় বড় কারখানা। লোকে বলে, চটকল।

পুঁটলি বগলে ভয়ে ভয়ে কারখানার গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় নিমাই। মস্তবড় পাকানো গোঁফ তুলে চোখ পাকিয়ে তাকায় দারোয়ান। কোন রকমে নিমাই জিজ্ঞেস করে ফেলে ঃ দেখেন, আপনে গো এইখানে একটা কাম দিতে পারেন ?

কেয়া বোল্‌তা ? নিমাই অবাক হয়ে দেখল অমন গোঁফ আর চোখ নিয়েও মানুষটা হাসতে পারে। দুনিয়ামে কাম নেহি হ্যায়। হাত নেড়ে বলে দিল দারোয়ান ভাগ্‌ যাও।

হ, দুনিয়ায় নাকি কাম নাই ? দক্ষিণে এগিয়ে চলে নিমাই। খিদে পায়। খাবে কি ? কে খেতে দেবে ?

দিন যায়, রাত্রি আসে। পথের ধারে শুয়ে রাত্রি কাটে নিমাইয়ের।

সকালবেলা নিমাই ভাবে, এ দেশে কি ছাই কামারের দোকানও নেই একটা !

আছে। জগদ্দল ছাড়িয়ে, নতুন বাজার পেরিয়ে এক কামারের দোকানের দেখা পেল সে। পাশে বিচুলি কাটার মেশিন-ঘর।

মস্তবড় টিকিওয়ালা হিন্দুস্থানী কামারের কাছে এগিয়ে যায় সে ঃ কর্তা একটা কাম দেবেন ? হাপর টানতে পারি, ছোটখাটো মাল বানাইতে পারি, ঘরের আর সব কামই করুম।

কামার তার কথা সব বুঝতেই পারল না। জবাব দিল ঃ কুছ নেই মিলেগা।

তবে যে আমার কোন গতি হয় না কর্তা ? বলতে বলতে বুঝি বা কান্না ফোটে নিমায়ের গলায়।

খিদেয় পেট জ্বলে। মুখ শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে।

কামার হাত দেখিয়ে বলল ঃ আগে দেখো।

নিমাই এগোয়। আগে কোথায় দেখব ? সবাই একই কথা বলে, পথ দেখিয়ে দেয়।

পথ, পথ আর পথ। পথের তো শেষ নেই। এদিকে পায়ে কাঁপুনি ধরে, পেটে খিঁচ লাগে। মাথাটা ঘোরে বন্‌বন্‌ করে।

মাকে তো মনে পড়ে না। মনে পড়ে রোশনারার মাকে, কামারবাড়ির বড় বউকে। যাদের কাছে গেলে মায়ের দুঃখ ঘুচত তার। বাপের কথা মনে পড়তেই অভিমানে বেদনায় ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে নিমাই। ছেলে ফেলে উধাও হল বাপ। বাপ তো! আর তার নিমাই ছেলে লায়েক হয়েও ওঠেনি।

জগৎ বড় কঠিন। নিমাইয়ের দু'ফোঁটা চোখের জলে কি তা ভিজবে!

রাত ঘনায়। নিমাই আর পারে না। পথের ধারে দাঁড়িয়ে ধোঁকে। এমনি উপোস নিমগাঁয়ে থাকলেও হত বা। কিন্তু সে তো গাঁয়ের মাটিতে ; এমন নিদারুণ কষ্ট হত কি ?···নিমগাঁ···নিমগাঁ সে দেশ নাকি আর তাদের নয়! কইলকাত্তা হল দেশ! ইস্‌! কয় কি।

অন্ধকারে একটা পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে নিমাই দাঁড়ায়, পুঁটলিটা চেপে ধরে বুকে। বেচবার মতও তো কিছু নেই তার। আর এ সংসারে একটা চাকবেরও কারো দরকার নেই।

এই ছাখো, এক ছোঁড়া এখানে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। একটা লোক আপন মনেই কথাটা বলে একটা আনি নিমাইয়ের হাতে গুঁজে দিল। নেরে নে। তোদের জ্বালায় তো আর পথ চলা যায় না।

ভিক্ষা! ভিক্ষা কি চেয়েছে নিমাই ? তার ক্ষুধাক্লান্ত মাথাটায় যেন আগুন লাগল। আনিটা হাতে চটকে চটকে ছুড়ে ফেলে দিল অন্ধকারে। পাঁচিল ধরে ধরে এগোয় আর দাঁত দাঁত চেপে বকবক করে নিমাই।

ভিক্ষা দেয়! দেশ নাই, তার দেশ ? কইলকাত্তা দেশ!

ইস! আমার দেশ কই ?

সুচাঁদের বারোমাস্যা

অনেক ঘাট বাট পেরিয়ে সুচাঁদ উঠল এসে রায়চরে। রায়চরে ঝুলনের মেলা বসবে কাল। গত সনের আগের সন মন্বন্তর গেছে। যুদ্ধ নাকি চলছে এখনো। ঝাঁক বেঁধে ওড়ে হাওয়াই জাহাজ। কুরমিটোলায় মিলিটারির ভিড় কাটেনি আজো। তবু আশা ছিল, গত তু' সনের থেকে এবছরের মেলা একটু জমবে। কিন্তু আকাশেব গতিক ভালো নয়।

শেষ শ্রাবণে ঝুলন। আষাঢ়েব ঢল নেমেছিল একটু আগে আগেই। আকাশে ঘোর লেগেছে শ্রাবণের। ভাবি ঘোর। বড় ঘটা। চিক্‌চিক্ বিজলী হানছে যখন তখন। যেন আকাশ জুড়ে বাসুকীর নোলা ছোঁক ছোঁক করছে। চেটেপুটে নেবে জগত সংসারটা! গুরু গুরু গর্জন, কড়কড় ঝঙ্কার রোজ। হাট বাজাবে কাজের মনকে অষ্টপ্রহর ডেকে ডেকে আকাশ তার ঘটা দেখাচ্ছে।

উত্তব-পশ্চিম দিকটা দেখতে দেখতে এসেছে সুচাঁদ। ওদিকে টঙ্গি, উত্তবে পূবলী, জয়দেবপুব, তারাগঞ্জ, চরসিন্দুর, সব ঘুরে, এঁকেবেঁকে এসে উঠেছে রায়চরে। বানার নদীতে জল নেমেছে আষাঢ়েই। পাটখেতের বুক ডুবেছে। বানারে যমুনার ঝাপটায় কালশিরা পড়েছে, ফুলেছে। ফেঁপে উঠেছে বালু নদী, চাপ দিয়েছে বংশী। চাপ দেয়নি ঠিক। যমুনার যে অনেক গান! বাজিয়ে ফিরছে বংশী নদী। সুরের ডাক কী! তীব্র কান্নার নীল সুর শেষ পর্যন্ত বানারের মহাকান্নায় এসে তরতর করে নেমে গেছে দক্ষিণে। ওদিকে উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে, নালা বিলের তলায় তলায় সিঁদেল চোরের মতো মাথা গলিয়েছে ব্রহ্মপুত্র। তারপর, নামো দক্ষিণে, আরো দক্ষিণে। বাঁকশাল, ঘোড়াশাল, জোড়াশালের কিনারে কিনারে

নিচে মেঘবরণী লখ্যা। এর মধ্যেই পার-হারাণী তীর-হারাণী তা-থৈ তা-থৈ। মহাসঙ্গম মেশামিশি করেছে মিশমিশে গাঢ় আকাশে।

রায়চরের গাঙ ফুলেছে। খানে খানে কাটাল। টানা স্রোতের বুকে হঠাৎ জল ঠেলে দাঁড়িয়েছে যেন উলটো স্রোত, সারি সারি, বাঁকা ঝক্‌ঝকে লম্বা হাঁসুয়ার মতো। টানা স্রোত মানে মানে ফণা গুটানো সাপের মতো পাশ দিয়ে গেছে বেঁকে। এর নাম কাটাল। সোজা টানে যে আসে ভেসে, তাকেই কাটে। দায়ের মতো নয়। হঠাৎ থামিয়ে, টুপ করে টেনে নেয় তলায়।

নৌকাগুলিকে ঠিক জুত করতে পারে না। জলে যাদের কারবার, তেমন সবল সেয়ানা মানুষ হলেও একটু বেকায়দায় পড়ে। মেয়েমানুষের চুল আর শাড়ি পেলে হয় একবার। বুকে করে নেবে। কচি-কাঁচা পেলে তো কথাই নেই। এক গরাস মাত্র। ঘূর্ণি অন্য জিনিস। লাট্টুর মতো পাক দিয়ে বোঁ করে টেনে নিয়ে যায় তলায়।

দেখতে দেখতে এসেছে সুচাঁদ। বুঝছে রায়চরের খালে আগেই লখ্যা ঝাঁপ দিয়েছে। এমনিতে বড় হাসির ছটা। হাসিতে ফেঁপে ফুলে কল্‌কল্‌ চল্‌চল্‌, যেন ভারি পীরিতের ইশারা। সুচাঁদ মনে মনে নমস্কার করে বলেছে, 'আলো সব্বোনাশী, ঢলানি, আর ঢলাইস্‌ না।'

পূবে বাতাসে গোলাপী নেশার আমেজ। মাঝে মাঝে খ্যাপা মাতালের চাপা গর্জন শোনা যায়। পূবের উঁচু ত্রিপুরা থেকে বাতাস ঢালুতে নেমে আসছে যেন জলের টানে টানে। সেই টানে বিজলী ঝলকানো আকাশটাও গড়িয়ে নেমে এসেছে এদিকে। নেমে এসেছে মুখে নিয়ে মেঘনার জল। উত্তর থেকে, থেকে থেকে আসছে ময়মনসিংহের টিলার বাতাস। নদী কংসের ক্রুদ্ধ শাসানি সেই বাতাসে। বাতাসে বাতাসে কাটাকাটি চলছে শূন্যে। তারপর জলে।

শুক্লপক্ষ যাচ্ছে। আগামী কাল পূর্ণিমা। কিন্তু এ কালি আকাশের কপালে কোনোদিন যে চাঁদ উঠেছিল, মনে হয় না। কোনোদিন উঠবে, সে ভরসাও নেই। শুধু বিদ্যুৎ আর নির্ঘাত বাজ।

তবু, রায়চরের গাঙে নৌকা লেগেছে মন্দ নয়। মেঘনার চালাঘরও উঠেছে কিছু কিছু।

গাঙের জলের ছিটা মাথায় দিয়ে নেমে এল সুচাঁদ। জায়গার নাম রায়চর।

শাসন করেন অকুলীন কায়স্থ দাশ মহাশয়েরা। ঝুলন তাদেরই।

কুচকুচে কালো সুচাঁদ। কালো শলুইয়ের মতো কোঁচকানো বাবরি। মা দুর্গার অসুরের মতো শরীর। খাঁটি নমঃশূদ্রের গঠন তার শরীরের। গোঁফদাড়ি কামানো মুখখানি মেয়েমানুষের মতো কোমল।

লাঠির ডগায় একটি বোঁচকা। একটু বড় বোঁচকা। বোঁচকার সঙ্গে একটি ছোট হ্যাবিকেন ঝুলনো। খালি গায়ে, লাঠির ডগায় বোঁচকা কাঁধে নিয়ে এসে উঠল সুচাঁদ। দেখা করল দাশবাবুদের সঙ্গে বৈঠকখানায়।

পায়ে হাজা পড়েছে সুচাঁদের। প্রতিটি আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে, গোড়ালি আর পায়েব পাতা অবধি বাসি মাংসের মতো নীরক্ত শাদা-শাদা ঘা। মাঝে মাঝে ফাটল, জমাট রক্তের আভাস। গাঙের জলে ধোয়া কালো থ্যাবড়া পা দুটিতে আলতা পরার মতো শ্বেত প্রলেপ পড়েছে।

সুচাঁদ বলল, 'বাবু, এট্টুস্ আমার চরণ দুইখান দেইখা নাইরাল ত্যাল দেন।'

এক বাবু বললেন, 'পাবি পাবি। অ্যাক্কেবারে যে জলের পোকা হইয়া গেছস্‌রে'? সারা ছ্যাশটা মইয়াইয়া আইলি নাকি ?'

সুচাঁদ হাত জোড় করে বলল, 'হ, তা-ই একরকম। উঁচান থেইক্যা আইলাম। অদিকে ঢল লামছে মন্দ না কত্তা। চণ্ডাইলা

নদী কংস যদি না বানে চ্যাতে, তা হইলেও, এইবার জলডা এট্টুস্ বেশিই হইব।'

বাবুদের মুখও অন্ধকার। একজন বললেন, 'হ, হেইরকমই তো দেখি। মেলাডা এইবার তেমুন জমব না মনে লইতেছে।'

সুচাঁদ বলল, 'হ।' তারপর হেসে বলল, 'তবে, ওই যে কইলেন না, জলের পোকা? খালি জলের পোকা না কত্তা, আমি পউষ্যা কালীর পাঁটাও। হাত পাও ফাটে শীত ঠাণ্ডার দিনেই। শুকাইতে জল আইয়া পড়ে। হাজা-ফাটা বারমাইস্যা। আমি আপনেগো পোকা আর পাঁটা।'

বলে গড় করল আবার। বাবুরা হেসে উঠলেন হ্যা হ্যা করে। বললেন, 'যা যা হারামজাদা, যা, তর লগে বকতে পারি না।'

সুচাঁদ কপালে হাত ঠেকিয়ে আবার বলল, 'আমি আপনেগো হারামজাদা।' বলে ঘর পেরিয়ে চলে গেল পেছনের নির্জন বারান্দায়। বাবুরা সঙের মসকরায় হাসতে লাগলেম পেট ফুলিয়ে।

সুচাঁদ বাবুদের বাগান দেখে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'হ, সোন্দর, বড় সোন্দর জমি, সোনার লাহান!...'

সুচাঁদ নিজে, আরো নাবালের, দূর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নমঃশূদ্র ঘরের ছেলে। বাপের আমলে কোনদিন নিজেদের জমি ছিল না। বারো বছর বয়সে ঢুকেছিল বজ্রহাটের মামুদ ফকিরের কৃষ্ণ-যাত্রার দলে। গলাখানি মন্দ ছিল না। শিখিয়ে দিলে ঢং-ঢাংও করতে পারত ভালো।

তারপর দিনকাল গেল খারাপ হয়ে। উঠে গেল যাত্রার দল। ততদিনে ভুঁইয়াদের দেওয়া চাকরান ভিটাখানিও গেছে। বাপ গেছে মরে। বোনটা চলে গেছে এক ডাকপিয়নের সঙ্গে। আর কেউ ছিল না।

মামুদ ফকিরের ভিটাতেই হল বাস। তাই বা কতদিন চলে। একদিন ফকিরের কাছ থেকে যাত্রার কিছু ছেঁড়া পোশাক নিয়ে দিল গায়ে। মুখে মাখল রং। দাঁড়াল গিয়ে বজ্রহাটের বাজারে।

'সঙ আইছেরে, বউরূপী আইছেরে,' বলে লোকে ভিড় করল। পয়সাও উঠল কয়েকটা। সেই থেকে শুরু। সেই থেকে সুচাঁদ—চাইন্দা বউরূপী।

বারো থেকে কুড়ি পর্যন্ত গেছে যাত্রা। কুড়ি থেকে আজ বারো বছর সঙ। এইবার সাজতে বসতে হয় সুচাঁদকে। রায়চরে যা পয়সা পাওয়া যাবে, একদিনেই। কালকেই রওনা দিতে হবে নসীরপুর। নসীরপুর থেকে সোজা ঢাকা শহরে। জল নেই, কাদা নেই, খটখটে শুকনো রাস্তায় হেঁটে বেড়াবে কিছুদিন। হাজা-ফাটায় টান ধরবে একটু। তবে, গণ্ডগোল মূলে। শহরে বড় সঙের ভিড়। রোজই সঙ। পেটের মধ্যে কুকুর ডাকে।

সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে নারায়ণগঞ্জ. মুন্সীগঞ্জ, সিরাজদিঘা, আবার বজ্রহাট। তারপর মেঘনার এপারে-ওপারে চক্কর দিয়ে ঠেলে উঠবে ওপরে পূব ঘেঁসে। উঠতে উঠতে ময়মনসিং থেকে আবার নামবে। নামতে নামতে আবার এই রায়চরে। তারপর নসীরপুর। নসীরপুর, নসীরপুর আব চাইন্দা, সোনার লাহান জমি না, এইবাব নসীবপুর।

তাড়াতাড়ি বোঁচকা খুলল সে।

এখন সম্বল পাঁচ আনা পয়সা। পয়সা রেখে বসল জলের ঘটি নিয়ে পেছনের বারান্দায়। মান্ধাতার আমলের একখানি ক্ষুর নিয়ে শান্ দিল।

তারপর ঠ্যাং থেকে পায়ের পাতা অবধি লোম চাঁছল। দুই হাত চাঁছল, বুক চাঁছল, মুখের তো কথাই নেই।

বোঁচকার থেকে বের করল পরচুলা। প্রায় রাক্ষসীর চুল, কচুরিপানার শুকনো শিকড়ের মতো। তাও আবার তালুতে ন্যাকড়া বেরিয়ে পড়েছে। হাজায় দেওয়ার নারকেল তেল দিয়ে ভাঙা চিরুনিতে আঁচড়াল সেই চুল। কাগজের নরমুণ্ড আর ছোট ছোট হাড়ের মালা বের করল। সব আছে বোঁচকাটিতে। বগলে বাঁধল দুটি ন্যাকড়ার হাত।

তারপর নীল রঙের ল্যাঙট পরে, গায়ে মাখল নীল রং। কালোর উপরে সেই নীল রং জলস্থলের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠল। শাদা খড়ির ত্রিনয়ন আর বগলে বাঁধা দুই ন্যাকড়ার হাত। মাথায় পরচুলা দিয়ে টিনের খাঁড়া নিয়ে, দাঁতে দাঁতে কামড়ে ধরল রাঙানো জিভ। একেবারে চতুর্ভুর্জ মা কালী।

ওদিকে রায়চরের গাঙ ফুলছে। তবু ভিড় হয়েছে মন্দ নয়। সারারাত্রি জল হয়েছে। সকাল থেকে পূবে সাওটা সোঁ সোঁ করছে! উঁচু থেকে গাছগাছালির মাথায় পা দিয়ে নেমেছে কিনা! সকলেই বলছে, ছ্যাওয়ার কপালে আগুন।

তাকে দেখে লোকে। সে দেখে, দূরে, গাঙের জল আর পাটখেত। রায়চরের গাঙ নেই আর। লখ্যা লক্‌লক্ করছে। তবে, এখনো রায়চরের দক্ষিণে, তিন হাত নিচে জল। কালীবেশী সুচাঁদ বলল মনে মনে, 'আলো সব্বোনাশী চলানি, এট্টুস্ থাম, নসীরপুরটা যাইতে দে।'

আর নসীরপুর। বেলা শেষে, হাতের চেটো খুলে গুণে দেখল তেরো পয়সা সম্বল।

দেখে সবাই, হাঁততালি দেয়, দেয় না কিছু। নেই কিছু, হবে কি! সোনার লাহান জমি কি আব দেবে? না, ধলা টুক্‌টুকে একখানি বউ···

আর চাইন্দা! খাইতে পাইলে শুইতে চাস্! সত্যি, আবার বউয়ের কথাও ভাবে সে কোন সাহসে!

পরদিন সকালবেলা মিলিটারি সাহেব সেজে সঙ দেখাল। মেলায় ভারি হাসির ধুম। ওদিকে গাঙের কিনারে লেগেছে চার-মাল্লাই নৌকা। খবর নিয়ে জানল, পাট কাটতে যাচ্ছে সবাই নাবিতে। নাবির দেশে ডুবে ডুবে গাছের গোড়া কাটতে হয়। মজুরিটা একটু বেশী পাওয়া যায়। নাবিতে কোথায় যাবে? শুনল, সোনাইগঞ্জ।

সুচাঁদ বলল, 'হাবলী ঝিলের উত্তর দিক দিয়া যাইবা?'

ঃ 'হু।'

ঃ 'আমারে নামাইয়া দিয়া যাও তোমরা কুড়াইল। আমি যামু নসীরপুরের জন্মাষ্টমীর মেলায়।'

নসীরপুর। আরে বাপ্পু ইস্‌রে! কুড়াইল থেকে চৌদ্দ মাইল নসীরপুর।

মাঝি বলল, 'তা যাইবা, চলো। দশটা পয়সা দিতে হইব।' বলতে না বলতেই চাপা আর্তনাদ করে, পায়ে হাত দিয়ে সুচাঁদ বসে পড়ল, 'আরে বাপ্‌রে, বাপ্‌রে, বাপ্‌রে......'

ঃ 'কি হইল, কি হইল?' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সবাই।

সুচাঁদ হেসে বলল, 'সঙ। সঙ দেখামু, লইয়া যান মাঝি ভাই। দশ পয়সা নাই।'

মাঝি আর পাটকাটারা হেসেই খুন। ডাক দিল, 'তাড়াতাড়ি চল।'

বিদায় নিল সুচাঁদ। বোঁচকা আব হ্যাবিকেন নিল ঘাড়ে।

রায়চরের মেলায় রোজগাব হয়েছে সোয়া সাত আনা। একখানি ছেঁড়া জামা, পুরোন ধুতি একখানা।

রায়চরের গাঙে লখ্যার জল এসেছে পশ্চিমদিক থেকে। গাঙ গেছে রায়চরের পূবদিক দিয়ে ঘুবে, এঁকেবেঁকে দক্ষিণে। চারমাল্লাই নৌকা ভাসল পশ্চিমে। গলুইয়ের মুখ বইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। ছেঁড়া পালে বুক দিয়ে পড়েছে উত্তর-পূবেব পাহাড়ি সাওটা। মেঘের চেহারা এখন নিরীহ। মেঘ দলা পাকিয়ে এলিয়ে গড়িয়ে নিচে নামছে যেন নেশা কবে। কেবল দূর উত্তরে ঝিকিয়ে উঠছে আকাশটা।

কিন্তু নৌকা ছুটল একটু বাঁয়ে চেপে, গোঁ ধরে।

নৌকার মধ্যে টোকা, হুঁকা, কাস্তে আর ছোট ছোট বোঁচকা অনেকগুলি। পাটকাটাদের গেরস্থালি। প্রত্যেকেরই সঙ্গে আছে হ্যারিকেন, নয় তো লম্ফ, তলা-পোড়া হাঁড়ি। বোঁচকার মধ্যে আছে

লুঙ্গি, নয় তো ধুতি, থালাবাটি-ঘটি, সব আছে। কুল্যে প্রায় পঁচিশ জন চলেছে পাট কাটতে।

দাঁড়িরা সব ছইয়ের ভিতরে বসেছে। সুচাঁদ রঙ্গ করল ঘণ্টাখানেক। তারপর ঘুরে ফিরে এল আবার জলের কথা। বংশীনদী যদি কালীগ্রাম ভাসায়, তবে সোনাইগঞ্জে পাট কাটা বড় বিপদ। থির জলে ডুবে কাটা এক কথা। সোঁতের জলে আর এক কথা। গাছের গোড়ায় হাঁসুয়ার পোঁচ দিতে না দিতে জল টেনে নিয়ে ফেলবে দূরে।

সুচাঁদ বলল, 'কেডা? বংশী? দশদিন আগে দেইখা আইছি। উনি তো কালী গেরামের পায়ে ধরছেন। অ্যাদ্দিনে সোনাইগঞ্জে কি আর টান যায় নাই? এইবার জলটা এট্টুস বেশি।' চিন্তিত মুখে পাটকাটারা তাকিয়ে রইল দূরের দিকে। ভেসে গেছে দুপাশের মাঠগুলি। গ্রামে জল ঢুকেছে।

একজন বলল, 'জলের লাহান দেবী নাই। মাইন্‌ষে কয়, ভূত-পিরেত সব বাতাসে ঘোরে। কিন্তু জলের সঙ্গেই আসল অপদ্যা-বতার বাস। ভাল কইরা ঠাওর কইরো, অনেক কিছু দেখবা।...'

সুচাঁদ বলল, 'হ, আমার পাও দুইডারে তো খাইয়া ফেলাইছে, এই দেখ।' বলে হাজা-ঘা পা দুটো দেখাল।

এটাও রঙ্গ ভেবে দুঃখের মধ্যে হাসল সবাই। হালমাঝি হাঁক দিল, 'কুড়াইল!'

লাঠির ডগায় বোঁচকা। বোঁচকার সঙ্গে হ্যারিকেন। কাঁধে ঝুলিয়ে নামল সুচাঁদ। 'চলি তবে, আসি ভাই, আসছে বছর আইয়ো চাইন্দ', নানান কথার মধ্য বিদায় নিল সবাই। নৌকা এগুল।

দূরে হাবলীবিল দেখা যায়। বিল নয়, দশটা লখ্যা নদীর মুখ একত্র হয়েছে যেন। ওই বিল পার হয়ে সোজা পশ্চিমে গেলে, ডাঙায়-ডাঙায় দক্ষিণে যাওয়া যায়। কুল্যে চৌদ্দ মাইল, তাহলে নসীরপুর।

কিন্তু নৌকার ভাড়া নেই সুচাঁদের। আধসেরটাক চাল আছে এখন সম্বল। কুড়াইল তো উপোসীভূতের গ্রাম। বিলে মাছ ধরে খায়। একটা নৌকা নেই কারুর ঘরে। মাটির গামলাতে চলাচল করে।

কুড়াইলের দক্ষিণ দিক দিয়ে চর-নিশিন্দা পার হওয়া যাবে। ডাইনে থাকবে হাবলীবিল। চরনিশিন্দায় চাষ হয়, বাস নেই। যা আছে, তাও খানে খানে, দূরে দূরে। উঁচুতে ধান, নিচুতে পাট। জায়গাটা একটু হাজা, বিলের ধার কিনা! বহুদূর, দুস্তর ছড়ানো জায়গা। তবে ডাঙা-পথ তো বটে। এখন একটু জল হয়েছে। কত আর! হাঁটু, নয় তো কোমর। তারপর হিজলবাগ। ঢাকা জেলার এইপারে জোয়ারের দেশে হিজলগাছ একটু কম। কিন্তু চরনিশিন্দার পর মাইলখানেক শুধু হিজলের সারি। হিজলবাগ আর একটু নিচে। সেখানেও বাস নেই। তারপর সোজাসুজি ইমলীপুর। তারপরে নসীরপুর। কুল্যে আট মাইল। না পৌঁছুতে পারলে হরিমটর। তাছাড়া ঢাকা শহরে যেতেই হবে।

কুড়াইলের দক্ষিণপ্রান্তে চলে এল সে। দুপাশে জল-ঘাসের সারি। মাঝখান দিয়ে জলের দাগ চলে গেছে এঁকেবেঁকে। ওইটি রাস্তা।

পা দিল সুচাঁদ। লোক দেখা যায় না একটাও। যাও আছে, বিলের ওদিকটায় মাছ ধরছে।

ছপ্‌ ছপ্‌ ছপ্‌…হাঁটু জলে চলল সুচাঁদ।

আকাশজোড়া মেঘ নেমে আসছে এঁকেবেঁকে বিশাল বাসুকীর মতো। মাঝে মাঝে চেরা জিভের মতো বিদ্যুতের ঝিলিক। বাতাসে ওড়া ছাইয়ের মতো বৃষ্টিকণা, গায়ে লাগে না। আসতে না আসতেই হাওয়া। বাতাসে পাটপচা গন্ধ। তার মধ্যে বেশ আঁশটে আভাস। এদিকে পাট কাটবে ভাদ্র আশ্বিনে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে ঘাসবনে। আর কোনো শব্দ নেই। শুধু ছপ্‌ ছপ্‌…

ছপ্‌ ছপ্‌ কমে এল। জলটা কোমর ধরছে আস্তে আস্তে।

পায়ের হাজাগুলি ভিজে উঠেছে এতক্ষণে। নিচের পাঁক ঢুকে জ্বালা ধরছে এবার। কচুরি-পানা দেখা যায়। হঠাৎ দাঁড়াল সুচাঁদ। তীক্ষ্ণচোখে একদঙ্গল কচুরি পানার দিকে তাকাল। পানা সরছে আস্তে আস্তে দক্ষিণে। বলল, 'আরে লইখ্যা ঠসইক্যা এদিকেও চলছস ?'

অর্থাৎ হাবলীবিলের তলায় তলায় লখ্যা এসে পড়েছে। টান লেগেছে মাঠের জলেও। তবে মন্দের ভালো। জলটা বেশি না বেড়ে থাকলেই হয়। পা চলবে একটু তাড়াতাড়ি।

পাটখেত দেখা দিল। মাঝে মাঝে ধানখেত। খেতের ধারে ধারে মালীশোলার বেড়া। লোকে বলে বাউতা শোলা, অর্থাৎ বেতো শোলা। খুব মোটা আর হালকা। ওই শোলাতে টোপর আর দুর্গার সাজ তৈরী হয়। খেতের মধ্যে পানা ঢুকবে, তাই বেড়া দিয়েছে।

হঠাৎ নজরে পড়ল, দূরের একটা পাটখেতের ধার দিয়ে দিয়ে কে যেন যাচ্ছে। হাঁটছে না, বোধহয় চারীতে অর্থাৎ গামলায় ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। যাচ্ছে, কিন্তু যা মেঘের ভার, দেখাই যায় না। যেতে যেতে আড়াল পড়ে গেল আবার।

মনটা একটু খুশি হল সুচাঁদের। একলা নয়, লোক আছে তাহলে চরনিশিন্দার নিরালা সমুদ্রে। দেখা না হোক, আছে, এই তো যথেষ্ট।

আকাশের এপাশে ওপাশে একটা আচমকা ফালা দিল যেন কেউ হাঁসুয়া দিয়ে। দুম্ করে শব্দ হল বাজের।

সুচাঁদ বলল, 'রইয়ো হে বউরূপী, চাইন্দা সও যায়।'

ঘাস পার হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। এখন কলমি আর হিঞ্চে, মাঝখান দিয়ে জলের দাগ। কলমি, হিঞ্চে হেলে পড়েছে দক্ষিণে, টানটা ওই দিকে। জলের টান যেন বাড়ছে আস্তে আস্তে। ঘাড়ের বোঝা কাঁধ বদলাল সুচাঁদ।

সামনে বেতবন। বুক ডুবিয়ে মাথা ভাসিয়ে আছে উপরে। পুবের হাওয়ায় ভারি শন্‌শন্ শব্দ তুলেছে জলের বুকে। একটু ঘুরে

যেতে হবে। বড় কাঁটা। সাপও এমন আশ্রয়টি জড়িয়ে-সড়িয়ে ভোগ করতে পারে না। কচুরিপানা আটকে আছে বেত-ঝোপের গায়ে।

নিমেষে একঝাঁক বৃষ্টি নেমে কাঁপ ধরিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু পায়ের ঘাগুলি যেন আগুনে পুড়ছে। মাঝে মাঝে সুড়সুড়ি লাগছে পাঁক ঢুকে। মনে হয় এবার পা দুটো তুলে, মাথা দিয়ে চলতে পারলে জুত হত।

জলটা বুক থেকে কোমরে ওঠা-নামা করছে। হাঁটু-জল আর পাওয়া যাচ্ছে না। পেছনে চেয়ে দেখল কুড়াইল হারিয়ে গেছে ঘাসবন পাটখেতে।

আবার বেত-ঝোপ দু-পাশে। চারদিকেই। কেন, রাস্তা ভুল হল নাকি? নাকি সঙ দেখায়।

না রাস্তা তো ভুল হয়নি। পা আটকাল কিসে! বেতগাছের শিকড় এক ঝোপ থেকে আর এক ঝোপে চলে গেছে। একই ঝাড়ের বংশ। খোঁচা লেগে একটি আঙুলে বোধহয় ছর ফুটে গেল। নসীরপুরের বাবুদের কাছে একটু তেল পাওয়া যাবে।

জলটা কিন্তু বড় পরিষ্কার। সাফ সাফ দেখা যায় নিচে; আঁশ-শেওড়ার বন আছে ডুবে।

বেতঝোপগুলি পার হয়েই, ছড়ানো মোতরা ঝোপ। কালো কালো ডাঁটা, বড় বড় পাতা মোতরার। ফুল ফুটেছে শাদা শাদা। জলে ডুবে গেছে ঝোপের গলা! মোতরার বাকল তুলে তৈরী হয় শীতলপাটি। বড় নাগিনীর ভীড় ওই ঝোপে। এখন অগতি নাগ-নাগিনীর গতি। অসহায় নাগ ছোবলায় আবার মোতরার বুকেই।

এক মুহূর্ত থমকাল সুচাঁদ। মোতরা ঝোপগুলি এড়ানো দরকার। গেল একটু উত্তর দিক দিয়ে। ঝোপঝাপ কম ওদিকটায়।

আবার দেখা। 'কে যায় গামলায় ভেসে! প্রায় ঝোপের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে যেন। সুচাঁদ হাসল একগাল, একবুক জলে দাঁড়িয়ে। গলায় সুর ঢেলে হাঁক দিল, 'কোন্ সঙ যাও হে।'

কোনো সাড়াশব্দ নেই। মাছ ধরছে নাকি নিঃশব্দে! কিন্তু এত দূরে। নাকি, কোনো পাকা বহুরূপী। হেসে উঠে আবার ডাক দিল, 'আবডাল দিয়া কে যান হে।'

আরো খানিকটা এগিয়ে, থমকে দাঁড়াল সুচাঁদ। কে? পায়ের তলা থেকে মাথা অবধি বিদ্যুৎ খেলে গেল। যেটাকে গামলা ভেবেছিল সেটা একটা হাত দেড়েকের কলাগাছের গুঁড়ির ভেলা। তার উপরে বসে আছে···ওটা কি ? শেয়াল !

হেসে ফেলল সুচাঁদ, 'আরে হালা বহুরূইপ্যা! চাইন্দা সঙের রূপ দেখাইতে আইছস্।'

শেয়ালটা ভয় পেয়ে ল্যাজটা গুটিয়ে প্রায় পেটের তলায় ঢোকাল। ভীত করুণ হলদে চোখে সুচাঁদের দিকে তাকাল। দাঁত বের করে, বড় করুণভাবে ডেকে উঠল কোঁক্ কোঁক্ করে। যেন বাড়ির পোষা কুকুরটা। ওদিকে টাল সামলাতে হচ্ছে টলমল ভেলায়।

সুচাঁদ যত এগুতে লাগল ভেলার দিকে, শেয়ালটা কুঁকড়ে কুঁকড়ে ছোট হতে লাগল! কিন্তু নামছে না। সুচাঁদ যে মারমুখী নয়, সেটা যেন বুঝেছে। একেবারে কাছে আসতে একটা ঠ্যাং জলে নামিয়ে, ঠিক কান্নার সুরে শেয়ালটা ক্যাঁকক্যাক করতে লাগল।

সুচাঁদ দেখল, ভেলাটার মধ্যে রক্ত। কয়েক ফালি রক্তাক্ত নেকড়া। এ বর্ষায় মড়া পোড়াবার ডাঙা থাকে না, ভাসিয়ে দেয় সবাই। বোধহয়, কোনো শিশুর মৃতদেহ ছিল এই ছোট্ট ভেলায়। লোভী শেয়াল খেতে খেতে ভেসে এসেছে, এখন অকূলে পড়েছে। সুচাঁদের মতো বুঝি।

সুচাঁদ ফিরে তাকাল জানোয়ারটার দিকে। জানোয়ারটাও তার দিকেই চোখ পিটপিট করে তাকিয়েছিল। যেন পোষা জীবটি, কিছুই জানে না। জলে ভিজেছে, কাঁপছে থর্থর্ করে।

সুচাঁদ বলল, 'প্যাটের জ্বালায় তুইও চাইন্দা সঙের মতো ঘর হারাইছস্রে বহুরূইপ্যা। মাইন্ষের ছাও খাইছস্রে হালা?' তারপর জল আর ঝোপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যদি মরি, তাইলেও

তর বড় ফলার হইব না? চল্, কেউ যখন নাই, তর লগেই এট্টস্ কথা কইতে কইতে যাই, মরি তো, ভালো কইরা খাইস্।'

এগুল সুচাঁদ। একটু ফারাক দিয়ে শেয়ালটা ভাসতে ভাসতে চলল ভেলায়। জলের টান দক্ষিণে, পথও দক্ষিণে। শেয়ালটার চোখ সর্বক্ষণ তার দিকে। মাঝে মাঝে আড়াল পড়ছে মোতরা আর বেত ঝোপে। মনে মনে বলল সুচাঁদ, 'হালারে না নাগে কাটে।'

সে প্রায় সস্নেহ গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'আরে ওই ঢ্যামনা সঙ, কোন্‌দিক দিয়া যাস, মোন্‌সায় খাইব যে।'

খ্যাঁকানি শুনে শেয়ালটার পাছাটা গুটিয়ে গেল। তাকাল অসহায় করুণ চোখে। একটু একটু দুলছে ভেলাটার তালে তালে।

সুচাঁদ ভেলাটায় হাত দিল। যেন পেটের ভিতর থেকে কঁকিয়ে উঠল শেয়ালটা।

ঃ 'উঃ, অ্যাক্কেবারে যে গেলি রে সঙ।' বলে ভেলাটা সরিয়ে নিয়ে এল একটু মোতরা ঝোপের কাছ থেকে। সুচাঁদ বলল, 'বাপ্পুইস্‌রে, গোঁফ দেখি রায়চরের দাশবাবুর মতন? রায়চর থেইক্যা আসতেছেন নাকি?'

শেয়ালটা ভয়ে ভয়ে পাছা পাতল। জল ঠেলার কষ্টটা কিছু-ক্ষণের জন্য ভুলে গেল সুচাঁদ। বলল, 'শোন্, ওর রায়চরের বাবুগো সঙ দেখাইয়া আইলাম, পয়সা দিছে চাইর আনা। আর ভালোবাইসা কইছে, দূর হ হারামজাদা।'

শেয়ালটা চোখ পিট্‌পিট্ করে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। সুচাঁদ বলল, 'হাসস্ নাকিরে? সঙ দেইখা? তবে বোঝ, রায়চরের এক নমঃর মাইয়া বুঁচি আবার আমার লগে পীরিত করতে চায়। মরণের লেইগ্যা। আঃ, সঙরে পায়ে বড় হাজা হইছে রে! বাবুরা নাইরেল ত্যাল দিছিল, জ্বালা যায় না তবু।'

জানোয়ারটা করুণ চোখে চেয়ে কাঁপতে লাগল। কিন্তু নজর ঠায় সুচাঁদের দিকে। সুচাঁদের মনে হল, সত্যি যেন কেউ আছে তার সঙ্গে। এই চরশিন্দার শ্বাপদসঙ্কুল জলজঙ্গলে মুখ খুলে গেল তার।

বলল, 'রায়চরে সঙ দেইখা আইছি। ক্যান, কালা চশমা চোখে দিয়া বাবুগো সামনে বইসা কইলাম, বাবু, বেশ সঙ দেখলাম। বাবু কইলেন, কইরে? বাবুরে দেখাইয়া কইলাম এই তো!'

বলে হা হা করে হাসল সুচাঁদ। শেয়ালটা ভয়ে ডাক ছেড়ে দিল, খ্যাঁক খ্যাঁক।

ঃ 'আরে ব্যাটা, খুব যে হাসি!'

সুচাঁদকে ঠেকতে হচ্ছে। এবার পায়ে পায়ে বাধা। পায়ের তলায় সাপলা আর কাইচ্‌লা।

এখন শুধু আঁশটে গন্ধ জলে। থেকে থেকে মোতরা ফুলেরও গন্ধ পাওয়া যায়। বড় শক্ত লতা কাইচ্‌লার। ডগায় ডগায় আবার নীল ফুলের বাহার। শালুক ফুল মুচড়ে গেছে দক্ষিণ দিকে।

শেয়ালটা একটু আগে আগে যাচ্ছে। ভাসছে কিনা। কাইচ্‌লার জটায় আটকাচ্ছে না পদে পদে। জলের নিচের অপদেবতারা যেন বাড়িয়েছে সহস্র হাত। কে যায়? ধরে রাখ, ধরে রাখ।

সামনে হিজলবাগ। দিনের বেলায়ও ঘুটঘুট্টি অন্ধকার যেন। হিজলের মাথা ঠেকেছে মেঘে। মেঘে-হিজলে-জলে একাকার। পার হলেই ইমলীপুর।

হঠাৎ বুকে আলতো স্পর্শে ফিরে দেখল, বেশ একখানি হলদে পেট বড় জোঁক শুঁড় ঢুকিয়েছে! আরে সঙ! টেনে তোলা যায় না। কখন ধরেছে! বড় মিষ্টি চাইন্দার রক্ত, না। ছুঁড়ে ফেলল জোঁকটা দূরে। রক্ত পড়ছে, থামানো দায়।

লক্ষ্য পড়ল জলের দিকে। আরে বাপ্পুইসরে। রক্তচোষার রাজত্ব যে! পরিষ্কার দেখা যায়, জলের নিচে বন। তার পাতায় পাতায়, পাতার মতো জোঁক। জলের টান, কিন্তু কামড়ে ধরে আছে। কিন্তু, মানুষের গন্ধ পায় বোধ হয়। সুচাঁদ দেখল, কুঁকড়ে কুঁকড়ে সব ভেসে আসছে তার দিকে।

সুচাঁদ তাড়াতাড়ি, জলের নীচে পায়ে হাত দিল। যা ভেবেছে। হাজা ঘা পেয়ে, গোটা তিনেকে ছেঁকে ধরেছে। টেনে টেনে তোলা

যায় না। তাই বোধ হয় জ্বালাটা কম ছিল। অসাড় হয়ে গেছে তো। টেনে টেনে তুলল।

শেয়ালটার দিকে তাকিয়ে দেখল। নজরটা তার দিকেই। ওদিকে জোঁক ধরেছে ওর নাকের কাছে। রক্ত পড়ছে টপটপিয়ে। কিন্তু ভয়টা মানুষকেই বেশি।

সুচাঁদ হেসে বলল. 'আরে সঙ! জোঁকে তরেও খায়!'

শেয়ালটা একটু ছোট হয়ে গেল কুঁকড়ে।

তারপরে হিজলবাগ। জলের তোড় বড় এখানে। চোখে দেখা যায় সব, কিন্তু অন্ধকার। বনস্পতি হিজলের ফাঁকে ফাঁকে এখানে জমাট বেঁধেছে মেঘ। পাখি-পাখালি কিছুই নেই। থাকবে কি করে। এখন নাগের বাস।

এখানে জল কোমরে। কিন্তু বড় টান। আপনি টেনে নিয়ে যায়। কল্‌কল্‌ শব্দ। ছল্‌ছল্‌ করে গাছের গায়ে। আবার কাটালের নকশা করে।

শেয়ালটা ক্যাঁকক্যাঁক করছে। ভয় পেয়েছে জলের তোড়ে। ভেলা গিয়ে মাঝে মাঝে ধাক্কা দিচ্ছে গাছে। অসহায়, বেসামাল। চকিতে আড়াল হয় আবার দেখা যায়।

সুচাঁদ বলে, 'যা সঙ, ভাইস্যা যা, তরে লইখ্যা টানছে।'

কিন্তু চোখাচোখি হতে বলল, 'ইস্‌। একেবারে কোলের পোলার মতো চাইয়া রইছস্‌ দেখি?' বলে, এগিয়ে ভেলাটা হাত দিয়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে দিতে লাগল। জোঁকটা ফেলে দিল নাকের থেকে টেনে। শেয়ালটা কোঁ-কোঁ করে উঠল। একটু একটু করে কমে এল হিজলের ঠাসাঠাসি। ওই দেখা যায় ফাঁকে ফাঁকে, ইমলীপুর।

ইমলীপুর, তারপর নসীরপুর। পা দুটি জলে ভেজা ন্যাকড়া হয়ে গেছে। জোর নেই। ঘা'য়েও সাড় নেই। তবু জোর দিল সুচাঁদ! জোর, খুব জোর! •

হিজলবাগ শেষ। আবার ঘাস-কলমি-হিঞ্চে। হঠাৎ ঝপ্‌ করে শব্দ হল। সুচাঁদ দেখল, ঝাঁপ দিয়েছে শেয়ালটা। সাঁতরে চলেছে

ইমলীপুরের দিকে। আরে সেয়ানা সঙ। পরাণ বড় সোনা! সুচাঁদের আগে আগে গেল।

সামনেই একটা ঝাঁকাল গাব গাছ। শেয়ালটার গতি ওই দিকেই। ও! এদিককারই বাসিন্দা বুঝি! দেখা গেল, গাব গাছের নিচে ছোট ছোট ঘাস, তবে ডাঙা। ইমলীপুরের ডাঙা।

শেয়ালটা ধরল গিয়ে গাব গাছ। সুচাঁদ তখনো হাত কুড়ি দূবে। ঠিক! মাটি দেখা যায়।

শেয়ালটা উঠে দাঁড়াল, একবার গা ঝাড়ল। থুলো দিয়ে নাক ঘষল, বোধ হয় জোঁকটা ফেলল। দেখল একবাব সুচাঁদকে, তারপরে রওনা দিল।

সুচাঁদ বলল, 'চললি? চাইন্দারে মনে রাখিস।'

কিন্তু একটু গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল শেয়ালটা। সুচাঁদও দূর জলেই দাঁড়াল। কি হল? শেয়ালটা পা তোলবার চেষ্টা করছে। পারছে না। টলছে, নড়ছে আর একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে।

ডুবছে! ও, প্যাঁক! অর্থাৎ পাঁক। মানুষ-ডোবা পাঁক কাদা! গোড়ালি উঁচু কবে, মুখ তুলল সুচাঁদ। দেখল, পেট অবধি ডুবে গেছে, ডাকছে ক্যাঁক ক্যাঁক করে। তাবপরে পিঠ ডুবল। মাথাটা বাকি।

আরে সঙ! তবে গেলি কেন। সুচাঁদ তো তোকে ওখানে গিয়ে বাঁচাতে পারবে না। শেয়ালটা কেঁউ কেঁউ করে ডেকে উঠল অসহায় কুকুর-বাচ্চার মতো।

হঠাৎ সুচাঁদের বুকটা ফুলে উঠল। মুখটা ফিরিয়ে নিল। তাহলে! হ্যাঁ, ওই উত্তরদিক দিয়ে, ওই কৃষ্ণচূড়ার তলা দিয়ে ঢুকতে হবে।

কৃষ্ণচূড়ার তলায় এসে একবার ফিরে তাকাল সুচাঁদ। দেখা যায় না শেয়ালটাকে।

'হালায় সঙ। মর, তর লেইগ্যা কেউ কান্দব না, কেউ না।'

কিন্তু কালো মুখটা জলে ভাসছে। শেয়ালের জন্য নয়, সঙ্গীহারা হয়ে। মেলায় এসে দেখল, গায়ের লোমগুলি আবার বেড়েছে। ক্ষুর নিয়ে বসল সে।

উত্তাপ

ট্রেনখানা বৃষ্টিতে নেয়ে এসে দাঁড়াল। আর ঠিক সেই সময়ে মেয়েটা আবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। আবার ধ্বক ধ্বক করে উঠল হরেনের বুকের মধ্যে। তার লিকলিকে শরীরের রক্তে রক্তে অসহ্য জ্বালা ধরে গেল। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে তার বুকের মধ্যে আরো তোলপাড় করে উঠল। দেখল, মেয়েটাও ওর লোকজনের সংগে সেখানেই নামছে। কোথায় যাবে এরা ?

ছোট স্টেশন। যাত্রীও খুব অল্প কয়েকজন। কিছু ক্ষেত-মজুর মেয়ে-পুরুষ। ভিজতে ভিজতে এসেছে। যাবেও ভিজতে ভিজতেই। টোকা, হুঁকো, বোঁচকা, টুকিটাকি সামান্য জিনিস হাতে কাঁধে ঝুলছে। কেমন ছন্নছাড়া ভেজা ভেজা একটা ভাব।

এখানেও বৃষ্টি হয়ে গেছে। হয়ে গেছে নয়, এখনো হচ্ছে। তেমন জোরে নয়। যেন হাওয়ার ঝাপটায় নেমে আসছে ইলশাগুঁড়ি ছাট। এর আগের রাস্তায় জল আরো তোড়ে নেমেছে। ট্রেনের ছাদ দিয়ে জল প'ড়ে কামরাগুলি পর্যন্ত ভেসে গেছে। মনে হচ্ছিল, গাড়িটাই বুঝি লাইন থেকে হড়কে পড়ে যাবে।

আষাঢ় মাস। কিন্তু যেন শ্রাবণের ধারা লেগেছে। মাঝে মাঝে থমকায়। একটু আশা দেয়। আকাশ দাঁত খিঁচোয় দূরে দূরে। ভাবখানা, যাবি যা, নইলে এলুম বলে।

এসেই আছে। গড়িয়ে গড়িয়ে আকাশটা অষ্টপ্রহর নামছে। মেঘ দলা পাকাচ্ছে উঁচু চড়াইয়ের মাথায়। মনে হয়, চড়াই পেরিয়ে উৎরাইয়ের ঢালু প্রান্তর দলা দলা মেঘে অন্ধকার হয়ে আছে। কাছাকাছি কোথাও চাষ-আবাদের লক্ষণ বিশেষ দেখা যায় না। যা আছে, খুব সামান্য। সবটাই লাল কাঁকর পাথরে ভরা। মাঝে

মাঝে কাজল চোখের চকিত চাউনির মত সবুজের ছিটে লেগেছে। কোথাও হঠাৎ এক সার ভূতের মত মাথা তুলেছে সোজা বাঁকা তালগাছ। তার ঘন বেষ্টনীতে খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে মেঘ অন্ধকার। তারপর দম আটকে চড়াই উঠেছে ঠেলে ঠেলে, হামাগুড়ি দিয়ে। এমন সময় আচমকা কয়েকটা শালগাছ। অন্যদিকে চোখ ফেরাতেই হয়তো দেখা যাবে ঝাঁকড়া মহুয়া গাছটা টলছে বাতাসে। কয়েকটা বিক্ষিপ্ত পলাশগাছ জলের ফোঁটা পড়া পাতায় পাতায় চেয়ে আছে বিষণ্ণ চোখে। তারপর কিছু নেই, যতদূর চোখ যায়। কেবল কালো কিম্ভূত আকাশটার তলায় এই উঁচু-নীচু বিশাল প্রান্তর যেন গেরুয়া আলখাল্লা-পরা রুদ্র সন্ন্যাসী, প'ড়ে প'ড়ে প্রতি লোমকূপ দিয়ে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে আষাঢ়ের ঢলে।

স্টেশনটা উত্তর বীরভূমের পশ্চিম ঘেঁষে। ক্রোশ দেড়েক পশ্চিমে গেলে সাঁওতাল পরগণার সীমানা। পশ্চিমে, দূরে, মেঘের কোলে মেঘের মত জেগে রয়েছে রাজমহল পাহাড়ের ইশারা। ইশারাটা দূর দিয়ে বেঁকে, অনেকখানি দক্ষিণে এসে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পুবে।

ট্রেন চলে গেল। হরেন সব ভুলে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল মেয়েটাকে। নিজের যাওয়ার কথা ভুলে, লক্ষ্য করছে ওদের গতিবিধি। যাদের সংগে মেয়েটা আছে, একটা বুড়ো একটা বুড়ি, একটি মাঝবয়সী মেয়েমানুষ। আর ওই মেয়েটা। টোকা, হুঁকো, বোঁচকা, এমনি সামান্য কিছু জিনিস ওদের হাতে কাঁধে ঝুলছে। চাষের কাজে মজুরি খাটতে যাচ্ছে কোথাও। প্রথমে মনে হয়েছিল সাঁওতাল। কথা শুনে বুঝল, সাঁওতাল নয়। বাউরী কিংবা বাগ্‌দী হবে। গাড়িতে উঠেছে ওরা নলহাটি থেকে।

মরদ নেই সংগে। মনে হচ্ছে, মেয়েটাই ওদের নিয়ে চলেছে। কালো রং মেয়ে। যেন ঝুঁটিওয়ালী একটি কালো মেয়ে পায়রা। মদ্দা এসে ঠুকরে খুনসুটি করবে। সেই আশায়, বুক উঁচিয়ে, মাথা হেলিয়ে দুলে দুলে চলেছে। চোখে দীপ্তি, গলায় বকম্ বকম্।

কিন্তু যাচ্ছে তো খাটতে, বোঝাই যাচ্ছে৷ আর সংগেও কয়েকটা বুড়োবুড়ি। তবে এত হাসির ঢুলুনি ঢলানি কিসের।

গাড়িতে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে! হরেন তার জীবনে অনেক মদ খাওয়া মেয়েমানুষের চোখ দেখেছে, সঙ্গও করেছে। ওই মেয়েটার টানা টানা চোখ ছুটিও যেন মদ খাওয়া চোখ। একদিকে যেমন শান দেওয়া, আর একদিকে তেমনি ঢুলুঢুলু। নেশা ধরিয়ে দেয়। নেশা ধরেও গেছে হরেনের। হেসে হেসে গাড়ির অনেকের প্রাণেই নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। বোধ হয় বিধবা। আসল বয়সে রং ফুটে বেরুচ্ছে হাতে-পায়ে, কথায়, হাসিতে। রং করার ইচ্ছে আছে প্রাণে। কিন্তু যাবে কোথায় এরা?

সে ওই দলটার পেছনে পেছনে এসে দাঁড়াল স্টেশনের বাইরে। পবনে তার ফিনফিনে মিলের ধুতি, পপ্‌লিনের চকচকে সার্ট। পায়ে কালো রং-এর বুট জুতো। রংটা ফর্সা, কিন্তু যতখানি বেঁটে, ততখানি রোগা। বয়স তিরিশ না হলেও মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে চল্লিশেরও বেশী। শরীরের ক্ষয়টা জামার ভাঁজেও ফুটে উঠেছে। যেন বাঁশ-ব্যাকাবীর কাঠামোর উপরে ঝুলছে জামাটি। শালিকের মত সরু বুক। তার উপবে আবার বোতাম খুলে দিয়েছে বুকের। গায়ে এসেন্সের গন্ধ।

বাপের আছে ভাল জমিজমা, ঘর পুকুর। ছেলে মাত্র হরেন। কুলকুনুটি বংশ কুলিন রায়ের ছেলে। আট বছর ধরে শহর শিউড়িতে ছেলে পড়ছে কলেজের এক ক্লাশে। বাপ টাকা পাঠায় নিয়মিত। হরেন টাকাটা সরস্বতীর পায়েই দেয়। তিনি হলেন ছুষ্টু সরস্বতী। বিদ্যের প্রকৃতিটা একটু অন্য রসের। আজকে যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে মেয়েটা, এ নেশা আট বছর ধরে রপ্ত করেছে সে। এখন দর্শনেই নেশা হয়, আর নেশার মত বস্তুও বটে।

সামনে এসে মেয়েটিকে ভাল করে দেখল সে। গায়ে জামা নেই। নির্ভাজ গ্রাবার নীচে দিয়ে রূপোর বিছে হার বুকের টান টান কাপড়ের ঢাকায় হারিয়ে গেছে। কানের ফুটোয় গোঁজা ছুটি

পেতলের মাকড়ি। সিঁথেয় সিঁদুরের আভাস দেখা গেল এবার। জলে ধুয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

মেয়েটা তাকাল হরেনের দিকে। তাকিয়ে হঠাৎ একটু ঠোঁট টিপে হেসে সরে গেল মাঝবয়সী মেয়েমানুষটির কাছে। ঠোঁট বেঁকিয়ে কি যেন বলল ফিস্ ফিস্ করে। মাঝবয়সী মেয়েমানুষটি ফিরে তাকাল। তারপর তাকাল বুড়োবুড়ি। কেমন যেন ছেলে-মানুষের মত চাউনি বুড়োবুড়ির।

বুড়ো বলল হরেনকে, কুথাকে যাবেন গ' বাবু ?

যাক, মুখ খোলা গেল। এবারে জানা যাবে গতিবিধি। হরেন বলল, কে আমি ? যাব তো রলাটি, কিন্তু—

রলাটি ? ওরা সবাই একসঙ্গে ফিরে তাকাল তার দিকে। বলল, অলাটি যাবেন। আপুনি। আরে বাপ ! গাড়ি নাই, গরু নাই, দুস্তর রাস্তা, ম্যাঘ-বিষ্টি। কী করে যাবেন গ' ?

সেইটেই এতক্ষণে হুঁশ হল হরেনের। তাইতো, চিঠি দিয়েছিল বাড়িতে গরুরগাড়ি পাঠাবার জন্যে। কিন্তু কাকপক্ষীও তো নেই। সে ফিরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কোথায় যাবে ?

অলাটি।

রলাটি ?

হঁ। ফি বছরে যাই। মজুরি খাটতে যাই গ'। ইবারে এট্টুস আগে আগে বেরলম। দেখেন ক্যানে আকাশের ভাব। সব ভাসায়ে লিবে মনে হচ্ছে।

হরেনের প্রাণে রস নামল আরো। রলাটি যাবে তাহলে ? একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চাইল সে। বলল, কার ঘরে কাজ করতে যাচ্ছিস্ ? কথা বলে এদিকে। নজর থাকে মেয়েটির দিকে। জবাব বুড়োই দিল, ইন্দির চাটুজ্যে মশায়ের ঘরে। অলাটির কুন্ ঘর আপনাকাদের ?

গদাই রায়, মানে গদাধর -

হঁ হঁ, বুঝলাম গ'। তা' আপুনি—

কথার মাঝেই সেই মেয়েটি কপট রোষে ফুঁসে উঠল, আ কী যন্তন্না গ' গপ্প করছ, ইদিকে যে দিন যায়।

সবাই নড়েচড়ে উঠল। বুড়ো বলল হরেনকে, চলি গ' বাবু। সাত কোশ রাস্তা যেতে যেতে বাতি জ্বলবে ঘরে।

হরেনকে এই সময়ে হঠাৎ কেমন বোকা বোকা মনে হতে লাগল। সে কিছু স্থির করতে পারছে না। এতটা রাস্তা হাঁটবার সাহস নেই তার। তার উপরে জল। ফিস্ ফিস্ করে পড়ছেই। একটা ছাতাও নেই সঙ্গে। সে অসহায়ের মত হা করে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে।

চোখাচোখি হ'তে মেয়েটা আবার হেসে উঠল খিলখিল করে। সারা শরীরের সঙ্গে রূপোর বিছেহারটিও কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের মত চমকে উঠল। হাসির মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিয়ে গেল পেছনে। খোঁপার উপর দিয়ে ঘোমটা তুলে, মাথায় বসিয়ে দিল টোকা। বুকে কেটে কেটে বসা হাসিটা নিয়ে হৃৎপিণ্ডহীনের মত দাঁড়িয়ে রইল হরেন। ভাবল, হুঁ! রং চায় মেয়েটা।

সামনের চড়াইয়ের গা বেয়ে বেয়ে মেঘ নামছে। লাল মাটির বুকে জল যেন ঢল নামিয়ে দিয়েছে রক্তের। বিদ্যুৎ ঝিলিকে টাট্‌কা রক্ত ক্ষতের মত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে লাল পাঁক। ক্রুদ্ধ খ্যাপা কুকুরের মত দূর আকাশ গর্‌গর্ করছে থেকে থেকে। থেকে থেকে দূরের রাজমহলের ইশারাটুকু হারিয়ে যাচ্ছে একেবারে। আবার যেন কেউ পেন্সিল টেনে বসিয়ে দিচ্ছে।

ওদের চারজনকে ছাড়া লোক দেখা যায় না একটিও। সামনের রাস্তাটা গরু আর মানুষের পায়ের দাগে এবড়ো খেবড়ো কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। ক্রোশ দেড়েক পশ্চিমে গেলে বীরভূমের সীমানা পার হয়ে সাঁওতাল পরগণা পড়বে। তারপর একটু দক্ষিণে এসে আবার খাড়া পশ্চিমে, সাঁওতাল পরগণার মধ্যে পাঁচ ক্রোশ রলাটি। দূরে দূরে কিছু সাঁওতাল গ্রাম, মাঝখানে হঠাৎ একটি বাঙ্গালী গ্রাম। কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস। সেই পাঠান যুগ থেকে এমনি আছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থমকে রইল হরেন। আবার ফিরে তাকাল দলটির দিকে। সেই মেয়েটা সবচেয়ে পেছনে। তাকিয়েও বুকটা রন্‌রন্‌ করে উঠল। মেয়েটার বলিষ্ঠ ঋজু পেছনটা যেন সমস্ত দলটিকে সাপটে হস্তিনীর মত দুলে দুলে চলেছে। দেখতে দেখতে আবার কানে এসে পৌঁছল হাসির অস্ফুট নিক্কণ।

আর দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে মন্ত্রমুগ্ধের মত পা বাড়াল হরেন। সঙ্গে সঙ্গে পূবে পশ্চিমে আকাশটা চির খেয়ে গেল বিদ্যুৎকষায়। মাটি যেন রক্তাক্ত মুখ হা করে হেসে উঠল। বাজ হানল আকাশে। হঠাৎ বাতাসে মরকুটে বাবলা ঝাড় নুয়ে নুয়ে পড়ল। সামনের ন্যাড়া তালগাছে সভয়ে কা কা করে উঠল একটা কাক। হরেন চীৎকার করে ডাক দিল, ওহে, ও বুড়া শুন ক্যানে।

ওরা দাঁড়াল চারজন। মাটিতে পা দিয়েই বুঝল হরেন, বুট জুতো কামড়ে কামড়ে ধরছে কাদা। ওইটুকুনি যেতে হাঁফ ধরে গেল। কাছে গিয়েই আগে মেয়েটির দিকে তাকাল সে।

মেয়েটি তার দিকেই নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। চোখে তার সেই মাতাল হাসি, একটু যেন ধারালো। ঠোঁটের কোণ তেমনি বেঁকে। বিদ্রূপ না মস্‌করা, সহসা বোঝা যায় না। কালো-পাথর-চড়াই বুকের বাস কিছু শিথিল হয়েছে।

বুড়োর দিকে ফিরে বলল হরেন, গাড়ি আসেনি, আসবে কিনা কে জানে। চ' তোদের সংগেই হাঁটা দি'।

বুড়ো বলল, আরে বাপ্‌! ই হয় না। আমরা জনমজুর মানুস্‌, তা'তেই আলামরা হয়ে যাই। আপুনি ক্যানে পারবে।

বুড়ি সস্নেহ গলায় বলল, হঁ। না না, ই হয় না।

মেয়েটি হঠাৎ ধারালো ছুরির মত চকিত হেসে বলল, প্রাণ চেয়েছে হাঁটতে। ব'লেই আবার চড়াইয়ে প্রতিধ্বনি তুলে হেসে উঠল।

বুড়ি বলল, আঃ, ই কি হাসি। বড় বেহায়া তু বউ।

মাঝবয়সী মেয়েমানুষটি মুখে আঁচল চেপে একেবারে চুপচাপ। বুড়ো আবার বলল, আকাশের গতিক ভাল না। আপুনি থাকেন

গ'। অলাটি কি এখানে? আমরা যেছি গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বুলব।

হরেন মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, না, যাব। এই তোরা ক'জনা রইছিস্। ছুটো সুখ দুঃখের কথা বলতে বলতে চলে যাব।

আবার চিক্‌চিক্ বিদ্যুৎ হানল। মেয়েটাও হাসল বিদ্যুতের মত। আবার এক ঝলক বাতাস নামল হুস্ ক'রে। মেয়েটা দ্রুতগতি মেঘের মত চকিত বাঁকে চড়াইয়ে পা বাড়াল।

বুড়োবুড়ি খানিকটা অসহায়ের মত চুপচাপ রইল। তারপর হাঁটা ধরল। এবার মেয়েটা সকলের আগে। চড়াইয়ের পরে মেঘ। যেন মেঘে মেঘে হারিয়ে যাবে, সেইদিকে নিশানা।

বাতাস এলে ছাট বেশী আসে। নইলে মন্থর ফিস্‌ফিসে। আর এই জলে পিছল মাটি পায়ে ধরে হ্যাঁচকা দেয়। দশ পা' হাঁটলে পাঁচ পা এগুনো যায়। পা নেমে আসে হড়কে।

হরেন একদিক ঘেঁষে চলল। যেখান থেকে মেয়েটাকে পুরো দেখা যায়। দেখতে গান মনে পড়ল। মনে পড়তেই গুন্ গুন্ ক'রে গেয়ে উঠল, সখী আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও···ওদিকে চোখাচোখি হ'ল মাঝবয়সীর সংগে মেয়েটির। আবার হাসি। বুড়োবুড়ি নির্বিকারভাবে উঠছে ঠেলে ঠেলে।

ওরা যত ওঠে, আকাশ তত ওঠে। উপরে বাতাসের জোর বেশী। বড় চড়াই। সময় নিচ্ছে উঠতে। তারপরে উৎরাই। সেখানে দশ পা নামতে, বিশ পা টেনে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় মুখ গুঁজড়ে ফেলতে। উৎরাইয়ে এসে, ঘাসের উপর দিয়ে চলল সবাই। ঘাসে পেছলায় কম। কিন্তু ঘাসের তলে তলে পাঁক। টেনে টেনে ধরে। যত না ধরে খালি পা, তার চেয়ে বেশী জুতো। উৎরাইয়ের ধাপে ধাপে হঠাৎ মাথা তুলেছে কয়েকটা তালগাছ। কোথাও কিছু নয়, যেন হঠাৎ কতকগুলি দত্যি মাথা নেড়ে নেড়ে কানাকানি করছে। খস্‌খস্ শব্দে হাসছে মানুষ দেখে। আর কিছু নেই। শুধু উঁচু নীচু উঁচু। মেঘে বসছে চেপে চেপে।

মেয়েটাকে শুনিয়ে হরেন জিজ্ঞেস করল বুড়োকে, ওই বউ দুটো কে হয় বটে?

বুড়ো টোকার তলা থেকে বলল, বিটার বউ। দু'টে বিটার বউ। বিটারা গেল্‌ছে সক্কালবেলা, আগে আগে। ইয়াদের লিয়ে এখন আমি চলছি।

সাবধানে সাবধানে নামছে হরেন। নজর আছে আগে আগে। যেখানে জলের মত তর্‌তর্‌ ক'রে গড়িয়ে চলেছে মেয়েটা। ওর কালো পায়ের শক্ত গোছা দেখে মনে হয়, মাটিতে বসলে আর উঠবে না। কিন্তু অমন পা দুখানি যেন পাঁকে বসছে কি না বসছে। ছিট্‌কে যাচ্ছে রক্ত পংক। লালে লাল হয়ে গেছে সকলের পা। হরেনের কালো জুতো লাল হয়ে এসেছে। কাপড়ে লেগেছে চাপ চাপ রক্তের মত।

হরেন ভাবছে, বুড়োর সংগে ভাব করা যাক আগে। রলাটির ছোকরা বাবুদের মন চেনে ওরা। কথাব ভাবে বোঝে, কি চায় বাবুরা। বলল, তবে ই বয়সে তুমাব, দু'টা বুড়াবুড়ির তো বড় কষ্ট হে?

বুড়ো হাসল টোকার তলায়। বৈরাগীর আত্মভোলা হাসির মত। বলল, কস্‌ট? কস্‌ট কি গ' বাবু। ই কি রোগ ব্যামো যে কস্‌ট হচ্চে? সম্‌সারে যাবৎ মানুষ খাটে, খাটতে হয়। সি কুন' কস্‌ট লয়। ইটা খাটুনি। যখন লারবে, তখন মনে কস্‌ট হবেক।

হরেনের মন বিগড়ে উঠল বুড়োর কথা শুনে। এর মধ্যেই তার বুকে হাঁফ লাগছে, গলায় উঠছে সাঁই সাঁই শব্দ। কোমরের গাটে গাটে কন্‌কনানি। আর ওর বুড়ো হাড়ে কোন কষ্ট নেই। ব্যাটা বজ্জাত, বেশীদূর হরেনকে এগুতে দিতে চায় না।

হরেন আবার বলল, তা' বউ বেটা সব চলেছে, লাতিলাত্‌কুর্‌ নাই?

বুড়ো খালি বলল, নাঃ!

বলতে গিয়ে বুড়োর বুকে যেন একটি দীর্ঘশ্বাস আট্‌কে রইল। আট্‌কে রইল যেন সকলের বুকেই। বুড়ো-বুড়ি, মাঝবয়সী আর··· না, মেয়েটার ভাব দেখে কিছু বোঝা যায় না। ঝুঁটি পায়রার মত বুক এগিয়ে নেমেই চলেছে। তবু কেমন একটা স্তব্ধতা।

কেবল পাঁকে পাঁকে থপ্‌ থপ্‌ চপ্‌ চপ্‌। কালো কালো কতকগুলি থ্যাবড়া পা, আর লাল কাদা। আকাশের ডাক বাড়ছে। ডাকছে ওই সামনের চড়াইটার মাথায়। চড়াইয়ের গা দিয়ে নামছে হিলিবিলি বিদ্যুৎ। চিক্‌চিক্‌ করছে তালবনের মাথায়। দগ্‌দগিয়ে উঠছে লাল পাঁক। তরল পাঁক গরুর গাড়ির লিক বেয়ে বেয়ে গড়াচ্ছে আঁকাবাঁকা সাপের মত। তরল কিন্তু আঁটালো। অন্ধকার আরো নামছে। কে বলবে, এখন ভর দুপুর। যেন সাঁঝের শাঁখ বাজানোর সময় হল।

আস্তে আস্তে ওদের চারজনের গতি কমছে না। বাড়ছে বাড়াতে হচ্ছে হরেনকেও।

তারপর অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বুড়ো হুস্‌ ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। যেন এতক্ষণ ধরে চেপেছিল দম। আর সেই মুহূর্তেই আকাশটা জলের তোড় নিয়ে গলে গলে পড়তে লাগল। পট্‌ পট্‌ ফুটতে লাগল ওদের তালপাতার টোকাগুলিতে।

তার মধ্যে গোঙানির সুরে বুড়ো বলল, হুঁ, ছোট বিটার এট্টা ছেল্যা হয়েছিল। তা' পরে মরে গেল গ' বাবু। এই সিদিনে, ছ' মাসের ছেল্যা !······

বুড়ির গলা দিয়ে শব্দ বেরুল, হুঁ-হ-হ····· ।

ও ! ওই মেয়েটারই ছ' মাসের ছেলে ম'রে গেছে। কিন্তু···

দূর ! বিরক্ত হয়ে উঠল হরেন। বৃষ্টিটা বেড়েছে। জুতো ভিজে ঢোল। কাপড়ের কোচা দিয়েছে মাথায়। কিন্তু সব সপ্‌সপে হয়ে উঠেছে। বুড়োও যেন বৃষ্টির মত ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করল।

সে লাফিয়ে লাফিয়ে আগে গেল। আগে, মাঝবয়সীটিকে পার হয়ে, তার আসলটির কাছে। হুঁ ! গালের পাশে এখনো

সেই হাসিটি লেগে রয়েছে।' আড়চোখে দেখছে হরেনকে। দেখছে, আর কেঁপে কেঁপে উঠছে ভ্রূদু'টি। মদ্দার খুনসুটি চায়।

পাশাপাশি দু' হাত ফারাকে এসে পড়ল হরেন। হাঁপিয়ে পড়ছে আসতে। বলল, কির‍্যা বউ, তু যে ঘোড়ায় জিন দিইছিস্।

মেয়েটি চকিত চোখে একবার তাকিয়ে দেখল হরেনের আপাদ-মস্তক। দেখে আরো হাসি পেল। পাওয়ার মত চেহারাই দেখাচ্ছে হরেনের। ভেজা জামা লেপটে, একটুখানি শরীরটি দুমড়ে গেছে যেন। কিন্তু চোখ জ্বলছে দপ্ দপ্।

জ্বলছে রক্তের মধ্যে। পথচলা আর দুর্যোগটা কাবু ক'রে দিচ্ছে। তবু নিজের রক্তে রক্তে মেয়েটার হাসির কাঁপুনিটা অনুভব করছে। পশ্চিমে ছাট জলের। টোকার তলা দিয়ে জলের ছাট এক বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে। ভিজে ভিজে যেন আরো তীব্রভাবে সব খুলে দিয়েছে রেখায় রেখায়। রেখার বাঁকে বাঁকে অস্পষ্ট বিদ্যুতের মত রূপোর বিছেহারটির শেষ দেখা যাচ্ছে। খেয়াল নেই, টানাগোছার সময়ও নেই। শুধু টেপা ঠোঁটের কোণে কোণে, টানা চোখের আঙিনায় কী যেন খেলে বেড়াচ্ছে। রং খেলছে। রং চায়। কিন্তু মেয়েটার সংগে পাল্লা দেওয়া শক্ত। দু' হাত ফারাক, দেড়হাত ফারাক করল হরেন। ওই আকাশের মেঘের মত মেয়েটার নিটোল পেশী দুলে দুলে যেন নেমে আসছে হরেনের চোখের সামনে। চোখের সামনে, বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে শরীরের উঁচুনীচু বাঁকে।

দারুণ বাতাস এল পলাশবনের মাথা দুলিয়ে। আকাশে আচমকা বিদ্যুতের কাটাকাটি ধাঁধিয়ে দিল চোখ। যেন অনেকগুলি খ্যাপা কুকুর তীব্র চীৎকারে মাতামাতি শুরু করল। চোখের নজর হারিয়ে গেল হরেনের। সামনে শুধু জলের ধারা। সেই সংগে অস্ফুট হাসির শব্দ।

বুড়োর গলা শোনা গেল, সামলে গ'। সামলে চল। আবার জোর লেমেছে। সামনে কিন্তুক্ লদী।

নদী আছে। হরেন দেখল, সে সকলের পেছনে। ছায়ার মত চারজনের দলটা তার আগে আগে। সে মনে মনে বলল, এঃ শালা, মরতে হবে নাকি? বৃষ্টির ঝাপটা তাকে যেন বুকে চেপে ঠেলে দিচ্ছে পিছনে।

পরনের কাপড়টি সে হাঁটুর চেয়েও এক বিঘৎ ওপরে তুলে ফেলল। তার সরু পায়ে জুতো জোড়া যেমন বড়, তেমনি ভারি দেখাচ্ছে।

রাস্তা বদলে গেছে। পাথর ছড়ানো রাস্তা। বড় বড় চাংড়া, খোঁচা খোঁচা হয়ে ছড়িয়ে আছে। তারই আশপাশ দিয়ে যেতে হবে। হরেনের চেয়েও বড় বড় পাথর। যেন হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে থম্‌কে আছে। মাথা ঠুকলে রক্তপাত নিশ্চিত। আর এরই তলে তলে পাঁক।

সামনে নদী। ছ' হাত চওড়া নদী। এখন কোমর জল। অন্য সময় পায়ের পাতা ডোবে না। কিন্তু কোমর জলেই যা টান। ব্যাং ছানার মত টেনে নিয়ে যেতে চায়। তোড়ের মুখে হাসছে খল্‌খল্‌ ক'রে।

মেয়েটাও হাসছে। জলের নীচে পাথরে হোঁচট্‌ খেয়ে একেবারে ডুব দিয়ে উঠেছে, তাই হাসছে। সে হাসিতে নদীর হাসিও চাপা পড়ে যায়।

হরেন পার হল। বুড়ি তখন ছোবড়া পাকাচ্ছে। বুড়ো টোকার তলায় কল্‌কে সাজাচ্ছে।

হরেনের চোখ তখন আধ ঘোলা। দেখল মেয়েটার গায়ে কাপড় নেই। রক্তের জ্বালায় না জলের ঝাপ্‌টায়, কে জানে, তার কাঁপন ধরল। কাপড় নেই নয়, আছে। না থেকে আছে। জলে ডুবে উঠেছে। কালো শরীর ছাপিয়ে উঠে ঝিলিক হান্‌ছে। কাপড় উঠেছে হাঁটু অবধি, পিঠ গেছে খুলে। কাছে যাবার জন্যে ব্যাংএর মত লাফাতে লাগল হরেন। মাঝবয়সীকে কী যেন বলছে মেয়েটি। ফিরে ফিরে দেখছে হরেনকে আর বৃষ্টিধারার মত মরছে হেসে।

আবার, আবার আসছে মুষলধারে। হরেন তবু কাছে গেল। মাঝবয়সীকে জিজ্ঞেস করল, তোরা হাসছিস যে?

মাঝবয়সী এতক্ষণে বলল, ক্যানে? তুমাকে দেখে। ক্ষ্যামতা নাই, আসতে ক্যানে গেলে।

হরেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে জবাব দিল, ক্যানে, এই তো চলছি।

তার হাঁপ ধরা দেখে ওরা দুজনেই হেসে উঠল। মেয়েটা আবার কাছাকাছি। চোখে বিদ্যুৎ হেনে হেসে বলল, সামনে নিদেন আসছে যে।

নিদেন। বুকের মধ্যে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে লাগল হরেনের। মরণ আসছে তার সামনে। তার পিঠের শিরদাঁড়ার কাছে কি যেন নামছে হিল্‌হিল্‌ ক'রে।

মেয়েটা আরো কাছে। ওর বৃষ্টি-ধোয়া গায়ের গন্ধ লাগছে তার নাকে। ওর নীচে ওপরে, বিশাল শরীরের প্রতিটি পেশীর পেষণ-শব্দও যেন কানে আসছে হরেনের। যেন রং চায় ওর প্রতি অঙ্গ।

কিন্তু রংটা ঘোলা হ'য়ে উঠছে হরেনের চোখে। পাঁক বাড়ছে। নিশিরাইয়ের কাছে আসা গেল। বুড়োও চেঁচিয়ে বলল, নিশি আই আসল গ'। আর একটু পা' চালাও।

নিশিরাই। হরেনের দাঁতে দাঁত লাগছে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে। শীত ধরেছে হৃৎপিণ্ডে। বিদ্যুৎ-কষায় লাল তেপান্তর দগ্‌দগে ঘায়ের মত লাগছে চোখে। তালের পাতায় চাপা তীব্র সুরে গোঙাচ্ছে বাতাস। যেন পেত্‌নী কাঁদছে।

ওরা মুখ বুঁজে চলেছে এবার। ওদেরও নিঃশ্বাস হয়েছে ঘন ঘন। থ্যাবড়া পায়ে মাটি থ্যাতলাচ্ছে।

মেয়েটা কোথায় উধাও হ'য়ে গেল। ওই, ওই যাচ্ছে। পায়রা নয়, নাগিনীর মত লক্‌লক্‌ ক'রে চলেছে। আর মনে হচ্ছে, তার হৃৎপিণ্ড উঠে আসছে গলা দিয়ে। উঠে আসছে আর নীচের থেকে অবশ হ'য়ে যাচ্ছে শরীর। অবশ, অবশ একেবারে।

আবার বাজ হানল কক্কড় শব্দে। একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেল হরেনের চোখ। শালিকের প্রাণ খাবি খাচ্ছে। পাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

আ হা হা······

বুড়োটা সস্নেহে সভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। বুড়ো বুড়ি ছুটে এল। তারপরে মাঝবয়সী। তার পেছনে সংশয়ান্বিত পায়ে পায়ে এল মেয়েটা।

বুড়ো বসে ডাক দিল, আ-হা-হা! উঠ, উঠ গ' বাবু। বলছিলাম তখন······

ওঠে না হরেন। জলে ভিজে ভিজে, হাড় কেঁপে অচৈতন্য হয়েছে। বুড়ো ব'লে উঠল, হে ভগবান। ইয়ার জ্ঞান লাই যে গ'।

জ্ঞান নাই। কে টেনে তোলে? বুড়ো বুড়ি কাহিল। মাঝবয়সী রুগ্ন। মেয়েটাই টেনে তুলল। তুলে নিয়ে গেল একটা মহুয়ার তলায়। বুড়ো অসহায়ের মত তাকাল পশ্চিমে। এখনো দেড় ক্রোশ! উই দূরে, পাহাড়টা গেছে আরো সরে। তার নীচে একটি কালচে রেখা। ওইটে অলাটি। অর্থাৎ রলাটি।

হরেন কাঁপছে থর্‌থর্ ক'রে। কাঁপছে আর লালা গড়াচ্ছে ঠোঁটের কষ দিয়ে।

বুড়ি বলল, বউ, নোকটার কাঁপন লেগেছে যে? বাঁচবে তো? মেয়েটির চোখেও অসহায়তা। তার টানা চোখে ভয় ও ব্যথা। বলল, তা—ই তো! আগে শুখনা কাপড় একখান দেও এখন।

বুড়ি তাই দিল বোচকা খুলে। মেয়েটি তার কোলে টেনে নিয়ে বসেছে হরেনকে। ভেজা জামা ছাড়িয়ে, মাথা মুছিয়ে শুকনো কাপড় জড়াল তাকে। নিজের টোকাটি দিল হরেনের মাথায় ঢেকে। মাঝবয়সী তার টোকাটি দিল হরেনের পায়ে। বৃষ্টি তো বন্ধ নেই।

তারপর কোলের ছেলেকে যেমন ক'রে ব'লে তেমনি সস্নেহ গলায় বলল, ইয়ার বড় বাড়াবাড়ি। আমরা যেছি অলাটি তো

খবর দিতুমনি ?. তা ই নোকের বড় বাড়াবাড়ি। বলতে বলতে হেসে ফেলল মেয়েটি। স্নেহকরুণ হয়ে উঠল চোখ। সেই চোখে সে দেখল হরেনের আপাদমস্তক। চোখাচোখি করল মাঝবয়সীর সংগে।

বুড়ো ব'লে উঠল, হঁ। নোকটাকে তু বাঁচা গ' বউ। ই বুড়া হাড়ে তো ক্ষ্যামতা লাই।

মেয়েটা বলল, অ মা! তবে কি মেরে ফেলছি নাকি গ'। বাপ মায়ের ছেল্যা তো এট্টা।

হঁ! বাপ মায়ের ছেল্যা!

হঠাৎ এই বর্ষণ মুখরিত রক্ত তেপান্তর খাড়াই উৎরাই কেমন যেন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল। তালপাতার বাতাসে গুমরে গুমরে উঠল কান্না। বাবলা ঝাড় বাতাসে মাটির বুক ভরে নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল।

ছোট বিটার ছ' মাসের ছেল্যাটার শোক চারটে বুকে পাথর হ'য়ে জমে আছে। সে তো বাপ মায়ের ছেলে ছিল!

মেয়েটা দু' হাত দিয়ে সাপ্টে ধরল হরেনের অচৈতন্য মুখ। ই কি বাড়াবাড় বাপু তোমার, অ্যাঁ? মানুষের জীবন, সে কি ছেলেখেলার জিনিস! ছেলেখেলা করতে এসে মানুষ এমনি ক'রে মরণ ডাকে।

হঠাৎ আবার কেঁপে উঠল হরেন। হাত পা খিঁচিয়ে থরথরিয়ে উঠল সর্বাঙ্গ।

এই, এ্যাই দ্যাখো ক্যানে কাণ্ডো।

সভয়ে বলতে বলতে মেয়েটি বুকের কাছে আরো আঁকড়ে নিল হরেনকে।

বুড়োও কাঁপছে। যত না জলে, তার চেয়ে বেশী ভয়ে। বলল, তোরা থাক ইখেনে। আমি যেছি। যেয়ে গাড়ি পাঠায়ে দিই।

মেয়েটি বলে উঠল, হঁ, তুমি যাও গ' বাবা, ই তো ভাল বুঝি না।

বুড়ো চলে গেল। মাঝবয়সী বলল মেয়েটিকে; গরম করতে হবে। শরীলে কিছু নাই।

মেয়েটি আরো বুকে চেপে ধরল। মাঝবয়সী বলল, আ দূর মরণ। বুকের ভিজা কাপড়টা ক্যানে চাপছিস্। আরো জল নাগছে যে মুখে। কাপড় সরা। লজ্জা কিসের? বাপ মায়ের ছেল্যাটা। বুকের ওম্ পেলে গরম হবে।

মেয়েটি কাপড় সরিয়ে দিল। কক্কড় করে বাজ হানল। সাপিনীর মত বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে নেমে এল মাটিতে। কিন্তু আকাশের সব ভয় সমারোহ এখানে কেমন শান্ত ও দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে। তাকে আড়াল ক'রে মানুষ মানুষের মৃত্যুশীতকে তপ্ত করছে। মেয়েটার বুকে ওর ছেলেটার দাগ রয়েছে এখনো। হরেনকে ওর উত্তাপের চাপে চাপে গরম করতে লাগল। একটু একটু ক'রে, অনেকক্ষণ ধরে।

যেন একটুখানি ছেলে, সবটুকু কোলে ধরা যায়।

এবার সত্যিকারের অন্ধকার নামছে। মেঘ তাকে গাঢ় করছে। এখনো গরাইয়ের সেই মানুষ ডোবা রক্ত পাঁক পার হতে হবে!

হঠাৎ মেয়েটা চমকে উঠল। বিছের মত সুড়সুড় ক'রে কি যেন উঠে এসেছে তার বুকে, কোমরের আশেপাশে। দেখল চোখ চেয়েছে হরেন। যেন স্বপ্ন দেখছে, এমনি বিস্ময়ে। যেন সেই বিস্ময়ের ঝোঁকেই আর একবার কেঁপে উঠল সে। বিস্ফারিত চোখে আর একবার দেখে হিংস্র চোখে হেসে উঠল সে। মুহূর্তে সরু সরু দুটো হাত দিয়ে মুঠো করে আঁকড়ে ধরল মেয়েটাকে।

মেয়েটা প্রথমে হরেনের জ্ঞান দেখে হেসে উঠল। হাত দুটো সরিয়ে দিল গায়ের থেকে। পরমুহূর্তেই হরেনের সেই রুগ্ন ছোট্ট মুখটার হিংস্রতা দেখে থমকে গেল। রক্তের মধ্যে সেই আগের দর্প পেয়ে হরেন প্রাণপণে হাত প্রবেশ করিয়ে দিল মেয়েটার দু' হাতের তলা দিয়ে। মুখ তুলে আনতে চেষ্টা করল ওপরে।

দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠল মেয়েটার টানা চোখ। তার বলিষ্ঠ নিটোল হাতের এক ঝটকায় ছিট্কে ফেলে দিল হরেনকে। বলল,

আ মরণ! কেগ্নোর মরণ গ'! বলে, সেই ক্রুদ্ধ মুখেও হেসে উঠল মেয়েটি, ই আর বাঁচবেনি দেখছি গ'।

বিদ্যুৎ চমকে, দিকে দিকে, উঁচুনীচু তেপান্তর যেন হাসছে রক্তাক্ত মুখে। আর তালের সারি যেন অশরীরী ছায়ার মত পায়ে পায়ে আসছে এখানে এগিয়ে।

হরেনের গায়ে এমনিতেই কাদা মাখামাখি। আবার কাদা লাগল। পাঁক থেকে মুখ তুলে কিছু একটা বলার উদ্যোগ করল। চোখ তার তখনো মেয়ে-বুকের উত্তাপে চক্‌চক্ করছে।

এমন সময় ওপরের চড়াই থেকে হাঁক শোনা গেল বুড়োর। বলদের ঘণ্টা শোনা গেল। গাড়ি আসছে।

গাড়ি এল, গদাই রায়ের ছেলেটাকে তুলল। তুলে চলল।

এতক্ষণে শরীরের যন্ত্রণায় হরেনের চোখে একটি নোনাধরা চোঁয়াচ্ছে।

বৃষ্টি তখনো তেমনি। ওরা চারজন গাড়ির আগে আগে চলল। মেয়েটির চোখ যেন হঠাৎ রুদ্ধ অভিমানে দুরন্ত হ'য়ে উঠল। বুকের কাপড়টি কষে টেনে দিল সে। ওদের পেছনে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে গাড়ির চাকা দুটো ককাচ্ছে। ককিয়ে কাঁদছে।

ন' নম্বর গলি

রাজধানীর উত্তর প্রান্ত থেকে যে সড়কটা সোজা বেরিয়ে এসে দু'ভাগ হয়ে গেছে তারই একটার নাম হয়েছে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। বাংলাদেশে ইংরেজের বিরাট শিল্প এলাকা গড়ে উঠেছিল এককালে এই রোডের ধারে ধারে।

এ রোডের প্রায় মাঝামাঝি অঞ্চলে, তার বুক চিরে যে অসংখ্য গলি পথ আচমকা চোখে পড়ে তারই একটার নাম ন'নম্বর গলি। সেই মাঠের ধারে রেল লাইনে গিয়ে মিশেছে গলিটা। বড় গলি। সেই গলিরও আছে আবার শাখা প্রশাখা। সেগুলোর নাম নেই, দরকারও নেই তার।

ভোরবেলা থেকে সুরু করে বিকাল পাঁচটা অবধি এ গলির অধিবাসীদের কাউকে বড় একটা চোখে পড়ে না। কারণ সকলেই থাকে কারখানায়। নেহাৎ রুগ্ন, বুড়ো, ছেলেমানুষ আর পোয়াতি মেয়েমানুষ ছাড়া ঘরের আগল কারুর খোলা থাকে না। দোকান ঘরগুলোর দরজা মাপে পোয়াটাক খোলা থাকে, এসময়ে খদ্দেরের ভিড় থাকে না বলে। কেবল খোলা থাকে রাস্তার মোড়ের বড় চা-খানাটা আর ধোঁয়াটে হোটেল ঘর দু'টো। রাত্রিচর চোর পকেটমার গুণ্ডারা আর এক আধটা সেপাই আড্ডা জমায় চাখানায় আর হোটেল গুলোতে চাপে ভাতের হাঁড়ি।

সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে, বিদ্‌ঘুটে গরম কেটে গিয়ে খানিক হাওয়া বয় তখন ধীরে ধীরে। সারাদিনের নিঝুম ঝিমুনো ন' নম্বর গলি চাংগা হয়ে ওঠে।

এসময়ে কারখানার খাটিয়েরা ঘরে ফেরে সবাই। প্রত্যেকটা ঘরেই প্রায় জ্বলে উনুন। তা'ছাড়া পথের ধারে জ্বলে তেলেভাজা-ওয়ালাদের উনুনগুলো। ফুলুরি, পেঁয়াজি, ফুচকা, দই বড়ার ঝাল

টোকো বিষাক্ত তেলের গন্ধে ভরে ওঠে বাতাস। ধোঁয়ায় দম আটকানো ধূসরতায় ছেয়ে ফেলে ন' নম্বর গলির আকাশ।

এসময়ে হাসি, গান, ঝগড়া-বিবাদ, বাচ্চাদের কান্না, ফেরীওয়ালাদের চীৎকারে এক বিচিত্র কলরবে মুখর থাকে ন' নম্বর গলি। মাতালের ভিড় বাড়ে, ভিড় বাড়ে সৌখিন রিক্সাওয়ালা, আর যোয়ান তাঁতী স্পিনারদের। চটকলের মধ্যে শ্রমিক হিসাবে যাদের চোখে পড়ে বেশী। অল্পবয়সীরা এসে সব আড্ডা জমায় ন' নম্বর গলির শেষের দিকটায়, যেখানে বেশ্যা বস্তিটা মৌচাকের মত জমাট বেঁধে উঠেছে, আলোর ঝলকে হাসি উপচে পড়ে যেখানে মদের বোতলগুলোর রঙীন মসৃণ গা বেয়ে।

ধাঙ্গরেরা তাদের পোষা শুয়োরগুলোর আস্তানার জন্য মাঝে মাঝে ভাবে। কিন্তু এ ন' নম্বর গলির মত অসংখ্য গলিগুলোর জন্য কেউ ভাবে না। এখানকার মানুষরাও বোধ হয়—এখানকার জীবন সম্বন্ধে অচৈতন্য। এর কোন বৈচিত্র্য নেই। তবু ন' নম্বর গলিকে আজ অচেনা মনে হবে। তার দৈনন্দিন চলার পথে কোথায় যেন মস্ত একটা হোঁচট খেয়েছে। এ গলির মধ্যে যারা ভাল, যাদের সকলে সমীহ করে, যারা সাহসী—তাদের ছোঁয়াচ যেন গলিটার সকলের মধ্যেই লেগেছে। ন' নম্বর গলি আজ তাই শান্ত, কিন্তু এত উদ্ধত দেখা যায় না তাকে।

ইলিয়াসের চাখানা থেকে উঠে পড়ল মতিলাল তার বিরাট চেহারাটা নিয়ে।

শের মতিলাল, ন' নম্বর গলির শের। খলিফা। ন' নম্বর গলির মধ্যে সবচেয়ে সম্মানের পদবী খলিফাগিরি যে দখল করেছে, আদায় করেছে প্রভুত্ব—সে হল খলিফা মতিলাল।

হাঁ, এককালে সে ছিল ওই রুস্তম, রঘুনন্দন, সব ভিন্ এলাকা আর এ এলাকার খলিফাদের একজন ছোকরা সাকরেদ মাত্র। বহু চড়-চাপড়, লাথ্ ঘুষা খেয়েছে ওস্তাদদের, তামিল করেছে বহুৎ কড়া হুকুম। বহু দুখ্ তখলিফের পর মহারাজা হনুমানজীর কৃপা হল

তার উপর। একদিন রঘুনন্দনকে ডেকে বসল পাঞ্জা লড়বার ফিকিরে। এস্‌পার নয় ওস্‌পার। বিগড়ে গিয়েছিল মতির মন। বুকটার মধ্যে ক্রোধ আর আফশোষ্ জমে জমে বারুদ হয়ে উঠেছিল। হাঁ, একজন থাক। হয় রঘু, নয় মতি।

হনুমানজীর কৃপা। আগুনের তাত লাগা লোহার রডের মত বেঁকে দুমড়ে পড়ে গিয়েছিল রঘুনন্দনের চওড়া লোমশ হাতটা।

এক বোঝা বেলফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল তাকে ন' নম্বর গলি। হাঁ, শের বটে। যোয়ান খলিফা। এলাকার রাজা। পঞ্চায়েত নয়, পুলিশ দারোগা নয়, জেল কাচারী নয়, যা করতে হয় সবকিছুর মালিক খলিফা। মহল্লার সরকার।

জেল খাটতে হয়, মামলা লড়তে হয়, সব ঝামেলা মাথায় আসবে খলিফার। খলিফা কিনা। আর এই হল এইসব মজুর এলাকার চলতি নিয়ম।

মতি উঠল ইলিয়াসেব চাখানা থেকে। সারাদিন কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়ে চোখ দু'টো হয়েছে ভাঁটার মত লাল। তা' ছাড়া বাতের সরাবীব আমেজটাও নিঃশেষ হয়নি এখনও। কানের সোনার মাকড়ি দু'টো চকচকিয়ে উঠল আলোয়।

এই হল নিয়ম। খলিফা হতে হলে, লোহা দিয়ে কান পিটিয়ে থেঁতো করে সোনার মাক্‌ড়ি পবতে হয়।

—'সালাম খলিফা!' রাস্তার আশে পাশে মেয়ে পুরুষ, বালক বৃদ্ধদের অভিনন্দন শোনা যায়। মতি দাঁড়ায় না। এক অদ্ভুত দৃপ্ত ভংগিতে, নির্লিপ্ত হাসিতে এগিয়ে যায়। সংগে যায় দু'চারজন—জংগী যোয়ান সাকরেদ।

—'এ্যাই ওপ্ শালা!' থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে, ঠাস্ করে একটা চড় কষালো সে রামধনির গালে। 'কেত্‌না দিন শালা তোকে মানা করেছি'—

একটা লাথি দিয়ে রামধনির তেল শুদ্ধ চড়ানো কড়াটা আর উনুনটা ফেলে দিল সে মাটিতে। খলিফার বিচার। রামধনিকে

সে মানা করেছিল তেলে ভাজা বিক্রী করতে এ মহল্লায়। কেননা, লোকটা বারো নম্বর গলির মানুষ।

—'ঠিক হ্যায়।' একজন সাকরেদ শাসায়; 'তুস্‌রা দিন দেখব, শালা তোর শির চড়িয়ে দেব উনুনে।'

'—হায় রাম!' রামধনি মার খাওয়া কুকুরের মত সামনের বস্তিটার গায়ে লেপটে যায়।

বৈজুর ছেলে লালু একটু দেমাকী কায়দায় আসছিল। ছোকরাটা আজকাল একটু ভাব ধরেছে উড়ু উড়ু। খলিফা চালে কথাবার্তা বলে, বুকটা চিতিয়ে দেয় সামনের দিকে। মহল্লার ছুকরীগুলোর উপর নজর তার বড় বেশী। খলিফার কাছে দু' চারটে নালিশও হয়ে গেছে তার নামে।

মতিকে আসতে দেখে, টুক্ করে মুদিখানার ঝাঁপের পাশে সরে পড়ে সে।

—'সালাম হো খলিফা!' কি একটা ওজন করতে করতেই বলে মুদীয়াইন। পরমুহূর্তেই ঝাঁপের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলে, 'ওখানে কি রে? কুত্তা না, বিল্লি?'

হ্যাঁ, ভারী খাপসুরৎ আছে মুদীয়াইন এখনও। দু' চারটে ছেলের মা বলে কিছুতেই মনে হয় না ওকে। ওর দিকেও নজর আছে লালুর।

কিন্তু গালাগাল শুনে চোয়াল দু'টো শক্ত হয়ে উঠল তার। রাস্তায় খলিফা, চেঁচানো সম্ভব নয়। চাপা গলায় খিস্তি করল সে।

—'কি বললি?' কপট রাগে ঝেঁজে উঠল মুদীয়াইন।—'বুদ্ধু কাঁহাকে, দেখবি—বোলাবো খলিফাকে?'

যেন মন্ত্রোচ্চারণ করল মুদীয়াইন। বোকার মত শান্ত হয়ে গেল লালুর মুখটা। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখল—মতির চেহারাটা মিলিয়ে গেছে কি না।

মিলিয়ে গেছে। এবার সে বেশ খানিকটা বুক টান করে ঝাঁপের পাশ থেকে বেরিয়ে প্রায় মুদীয়াইনের গা ঘেঁষে বসে।

—'কি বলছ—?' মুদীয়াইনের সারা দেহটা সে চোখ দিয়ে চাটে।

—'বলছি, তোর উমর কত হল রে ছোকরা?' পান খাওয়া পাতলা ঠোঁট ছ'টো ধনুকের ছিলার মত বেঁকে ওঠে মুদীয়াইনের। কাঁচা প্রাণ ভরে ওঠে লালুর রূপ রসে। কিন্তু কথার ঘা'য়ে ভেঙে যায় সে রসের ভাণ্ড।

—'তোর এ গরব একরোজ টুটিয়ে দেব।' উঠতে উঠতে বলে লালু; 'হপ্তা হরতালটা চুকে যাক্, তোদের ওই বুঢ়া খলিফাকে তারপর পাঞ্জায় ডাকব। সেদিন—'

নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠল তার চোখে। মুদীয়াইন হেসে উঠল খিল্ খিল্ করে।

—'থোড়া কেড়ুয়া তেল লিয়ে যা, কবজিতে মালিশ করবি।'

লালু তখন চলতে সুরু করেছে।

মুদীয়াইন ডাকল; 'এ রামু, ভোলা, এ নরেশ ভাইয়া—লালুর বাত শুনে যাও তোমরা।'

কিন্তু আজ কেউ আসবে না, তা' সে জানে। অন্যান্য দিন এতক্ষণ তার দোকানে আর দোকানের ধারে খাটিয়ায় জোয়ান বুড়োদের ভিড় লেগে যায়। মরদগুলির সঙ্গে ঢলে ঢলে গল্প ক'রে। হেসে গড়িয়ে মুদীয়াইন পাড়ার মেয়ে বউদের বুকে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। মরদগুলি যে তাদেরই মরদ, বাপ, ভাই। কেউ কেউ চুপ ক'রে থাকতে না পেরে এতক্ষণে তুবড়ি ছুটিয়ে দেয় গালাগালির। কিন্তু মুদীয়াইনের তাতে যায় আসে না কিছুই।

কিন্তু আজ কেউ আসবে না। মুদীয়াইন ভাবে—মিন্‌মিনে বোকা বোকা দেখতে এই সয়তানগুলো—কারখানায় নাকি কি একটা গোলমাল বাধিয়ে এসেছে। হপ্তা ওঠায়নি কেউ আজ। মুদীয়াইনের ধার তো শোধ হলই না। এর উপর আবার হারামজাদাগুলো নাকি কাল বিলকুল কারখানা বন্ধ করে দেবে।

মহল্লা খলিফার কানে এখনও যায়নি কথাটা। সে বহাল তবিয়তে হাতীর মত ঢুলতে ঢুলতে চলেছে- সরাবীর দোকানের

দিকে রোজকার মত। ছনিয়া কেঁপে উঠুক, এই সময়ে পয়লা সরাব, তারপর সব বাত পুছ্ হবে।

কিন্তু তারও মনে খট্‌কা লেগেছে। গলিটা যেন এখনও ঝিমিয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। নেহাৎ ফাঁকা আওয়াজ—'সালাম খলিফা', তার বেশী কিছু নয়। গান নেই, হল্লা নেই, নেই মাতোয়ালের চীৎকার—। মনে মনে বলে, 'কেয়া বাৎ?'

বাতের নিকুচি করেছে, এখন চাই সরাব্! হাঁ সরাব।

মোড়ে মোড়ে জটলার বহর বাড়ছে। তর্কের ঝড় বইছে। বাজে মাথা-গরম-করা তর্ক। নাংগা ফকির খালি-পেট মাথা-গরমের দল। মায়া লাগে মতির, সকরুণ হাসে সে। আদমি নয়, জান্‌বার আছে। জান্‌বার। জানোয়ারদের খলিফা সে। কম্‌তি মহব্বত, জাস্তি মার যাদের দাওয়াই।

—'চোপ! লাগাব দো ঝাপর।' বলতে বলতে রামচন্দব কষিয়ে দিল ছ'টো চড় তার বহুর গালে।

—'এ্যাই—ওপ!' হেঁকে উঠল মতি।

আরে বাপ রে! খলিফা!

—'সালাম খলিফা।'

—'শালা, মারতা কাঁহে?'

—'শালী খালি খানে মাংতা। খানা কাঁহা? রূপেয়া নেহি—'

—'বাস্ বাস্। ঝগড়া করবি না।' গোলমাল চায় না মতি। শান্তি চায়, শান্তিরক্ষক খলিফা সে।

কিন্তু মনে পড়ল না তার আজ হপ্তার দিন রূপেয়া কেন নেই ওর হাতে।

চায়ের দোকানগুলোতে মাঝারী ভিড়। রোজকার মত গানে গল্পে উচ্ছ্বসিত ভিড় নয়, স্তব্ধ চিন্তিত হাত পা গুটিয়ে বসা ভিড়।

—'সালাম খলিফা।' বেয়াকুফগুলোর হাত পর্যন্ত ওঠে না কপালে। অনিচ্ছার অভিনন্দন, থোড়াই কেয়ার করা ভাব। নিজেদের নিয়েই সব মশগুল্। কেয়া বাত? খলিফা না মতি?

হতাশ পেশোয়ারী আর কাবুলীওয়ালারা বিচিত্র ভাষায় ফিস্‌ফিস্‌ করে গালাগাল দিতে দিতে ফিরে চলেছে। না স্থদ, না আসলী। কোন ব্যাটা একটা আধেলাও ছোঁয়াল না। বলে, হপ্তা হরতাল কিয়া হ্যায়…

'—আরে এ শালে।' রাজিন্দর ওর ছেলেকে হাঁকল।— 'চুল্লী জ্বালাতা ক্যায়া, হামারা শির পাকায়েগা?'

ছোট ছেলে। মা নেই। বাপকে কারখানা থেকে ফিরে চুপ চাপ থম্‌ ধরে বসে থাকতে দেখে নিজেই উন্থনে আগুন দেবার চেষ্টা করছিল। পেটের জ্বালা। বাপের খামখেয়ালীতে বেশী রাত করতে সে রাজী নয়। কিন্তু কথা শুনে থম্‌কে গেল।—'ভুখ লাগতা হ্যায়!'

ভুখ্‌ লাগতা হ্যায়! সারাদিন একলা পড়ে থাকে। বাপকে কাছে পেলে চাঁদ হাতে পায় ছেলেটা। আত্মরে মনে হয়। ওই ত্নটো কথা বলতে চোখে জল দেখা দেয়।—ভুখ্‌ লাগতা হ্যায়!

হাত ধরে ছেলেটাকে ধরে বুকের কাছে নিয়ে আসে রাজিন্দর। -'চল্‌, থোরা চা উ পি' কে আয়ি! ক্যায়া করেগা, হপ্তা হরতাল হুয়া হ্যায় না?'

—'সালাম খলিফা!' ছেলেকে নিয়ে রাজিন্দর রাস্তায় বেরোয়।

—'সালাম।' ছেলেটাও মতিকে অভিনন্দন জানায়।

—'জীতা রহো বেটা।'

খলিফার চাল, খলিফার ইজ্জৎ। ত্নধ পিনেবালা লেড়কাও সেলাম দেবে।

তেলেভাজাওয়ালী অবলা এর মধ্যেই পাত্‌তাড়ি গুটাচ্ছে দেখে তাজ্জব মানল মতিলাল।

—'আভি চললি যে?'

—'তা কী করব?' অবলা ঠোট বাঁকায়।—'বিকি কিনি নেই, ভাজা মাল ঠাণ্ডা হয়ে জমে যেতে লাগছে। এতক্ষণ নাইনে দাঁড়ালে রোজগার হত।'

হাঁ? ক্যায়া, শালা ভিখারী বনে গেল ন' নম্বর গল্লি?

—'দে, হামকো আঠ আনার মাল দে।'

মিশি দেওয়া দাঁত বেরিয়ে পড়লো অবলার। ফুলুরি আর পেঁয়াজী দিতে দিতে বলে, 'তা, খলিফার আর আমাদের নাইনে যাওয়া হয় না কেন?'

মতি হাসল।—'তোদের লাইনটা বিলকুল বুডঢীদের লাইন আছে।'

—'তা' একদিন না হয় মুফতেই মহব্বত দিয়ে এসো।'

সাকরেদের হাত থেকে পয়সা নিয়ে অবলা সরে পড়ে।

মোড়ে মোড়ে জটলা। বহু জেনানার দল মুরগীর ডিমে তা' দেওয়ার মত ঘরে বসে আছে। ঘরে ঘরে গালি খিস্তি ঝগড়া গোলমাল নেই। নেই হাসি গান হল্লার কান-ঝালাপালা-করা শব্দ।

খলিফা মতিলাল একেবারে অনভ্যস্ত সাঁঝ বেলায় মহল্লার এ ঝিমুনিতে। অনভ্যস্ত ন'নম্বর গলির পুরনো নোংরা জীবন।

কি ব্যাপার? খালি বাচ্চা লেড়কাগুলোর ঘ্যান্‌ঘ্যানে কান্না। কান্নার মধ্যে খালি ভুখা শব্দের ছড়াছড়ি। আর মোড়ে মোড়ে জটলা।

হাঁ, একটা খটকা লাগে।

যা-নে দেও। সরাব না টানলে—কিছু দিমাকে ঢুকবে না।

ন'নম্বর গলির বাঙ্গালী পাড়া।

দু'একটি কেরানীবাবু আছে বাবুসাহাব বাড়ীওয়ালাদের দুএকটা আব্রুওয়ালা পাকা বাড়ী নিয়ে। আর সবই মিস্তির মজুর কুলির দল।

একই দৃশ্য এখানে।

মোড়ে মোড়ে জটলা। মাথা গরম করা হাঁক ডাক বাজে কথা।

সম্প্রতি এখানে আরও ভিড় বেড়েছে। পাকিস্থানী হিন্দু বাঙ্গালীদের ভিড়। মুরগীর বাচ্চার পালের মত আনাচে কানাচে

ছড়িয়ে পড়েছে মুলুক-ছাড়া মানুষেরা। যে বিচারে এসব হয়েছে, সেই বিচারে থুক্ দেয় মতিলাল।

—'সেলাম খলিফা!'

—'এই পরেশোয়া!' পরেশকে হাঁকলো মতিলাল।

লালুর দোস্ত পরেশ। পকেট মারে এ ছোকরা। কিন্তু আজ বড় ঝিমিয়ে পড়েছে। আজ সারা এলাকাটার পকেট খালি হয়ে গেছে। বরাত্! নিজের বাপটার ওপরও রাগ হয় তার। শালারা হপ্তা হরতাল করেছে। খেতেই জোটে না, তার আবার—। আজ তো নিশ্চয়ই ভাত বন্ধ। হপ্তা যখন হয় নি।

কিন্তু হিম্ হয়ে গেছে তার বুক, খলিফার ডাক শুনে।

—'কি বে শালা, গরীব বেচারা কার্তিকের ছুঠো রুপেয়া মেরে দিয়েছিস তুই ওর লেড়কার দাবাই এনে দিবি বলে?'

ঠাস্ করে একটা চড় পড়ে পরেশের গালে।—'কমিনা কাঁহাকে। আর শালা কেতনা দিন হামি মানা করেছি— কি ই এলাকায় পাকিট মারবি না।'

আর একটা চড় পড়ে অন্য গালে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটো টাকাও দেয়। —'লে, আভি দিয়ে দে কার্তিককে।' মারের পরই টাকা। বাপের কাছে মার খাওয়া শান্ত ছেলের মত নীরবে চোখের জল মোছে পরেশ। যাক্, উপোস থাকতে হবে না বাপের হপ্তা হরতালের জন্য। এ টাকা দিয়েই আজ···। ঘরের দিকে গেল সে।

রাস্তার আলো আঁধারিতে দেখল একটা কাবলে তার বাপকে টাক-পড়া মাথাটায় চাপড়ে চাপড়ে বলছে, 'টুম্‌লোক বুঢ্ঢু আছে। হপ্তা উঠাও, আপনি খাও, হামার ছুড্টা মিটাও। মালুম?'

—'হাঁ।' কেঠো হাসি হেসে মাথা নাড়ে পরেশের বাপ।—'কিন্তু খাঁসাহেব, এটা আমাদের রুজির লড়াই হ্যায়, কাল তো তামাম কারখানা বন্ধ রহেগা।'

—'কুচ শুনবে না।' ঝেঁঝে ওঠে কাবুলিওয়ালা। —'কাল হামার ছুড চাই, বেগর-ছুডকে ভি ছুড হোবে।'

সালোয়ারের ঝাপটা দিয়ে চলে গেল সে।

এবার চোখ তুলতেই পরেশকে চোখে পড়ে তার বাপের।—'কুত্তার বাচ্চা!' ঝেঁঝে উঠল বাপ, আমার মরা মুখ দেখতে এসেছ শালা? এসো, আজ পিণ্ডি গেলাচ্ছি তোমাকে।'

পরেশ কিছু না বলে, একটু ইতস্তত করে খলিফার দেওয়া টাকা ছুঁড়ে দেয় বাপের দিকে।

—'নেই মাংতা।' রাগের চোটে হিন্দী বেরিয়ে পড়ে বাপের। টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে পরেশের পায়ের কাছে।—'রোজগার করবে না, হারামজাদা পকেট মারবে আর গিলবে। বেরো, হট যা।'

পরেশ নির্বিকার ভাবে সরে পড়ে। খানিকটা গিয়ে একটা লাইট পোস্টের আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখে বুড়ো কি করে।

বুড়ো মাটিতে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে টাকাটা, আর গালি দিচ্ছে।···

বেশ্যাপল্লী।

ফাঁকা, চুপচাপ। বসে দাঁড়িয়ে এধার ওধার ছিটকে আছে মেয়েগুলো। নতুন মুখের আশায় তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে চারিদিকে। বাবু ভদ্রলোকদের আশায়।

আজ ভিড় নেই সৌখিন রিক্সাওয়ালা, মজুর, তাঁতীদের। গান নেই, হল্লা নেই মাতোয়ালের। গন্ধ নেই ছড়িয়ে—চামেলীর তেল আর বেলী ফুলের।

কেয়া বাৎ?

খটকা লাগছে খলিফা মতিলালের।

—'আইয়ে, খলিফাজী আইয়ে, সর্দারজী আইয়ে!'

দু'হাত তুলে অভিনন্দন জানাল মদের দোকানের মালিক—কুণ্ডু বাবু।

কেয়া বাৎ? তাজ্জবে ভ্রূ কুঁচকে গেল মতির। সরাবখানাটাও খালি! কেয়া, মর্‌ গয়া নও লম্বর গল্লি? কুলি কামিন তাঁতী রিক্সাওয়ালা, ছোকরা ফিটার স্পিনার—কোথায় গেল সব? কাঁহা

গেল বিলাসপুরী দিলদরিয়া মেহেরারুর দল, নাংগা মাতায়ালে, শরাবপিনেওয়ালীদের হাসি গান হল্লা ? কাঁহা সুখন, সাবীর, যারা মদখাওয়া বিলাসপুরী মেয়েদের গা থেকে কাপড় খুলে দিয়ে বহুৎ বঢ়িয়া বাহারে ফুর্তি সোরগোল মচায় ?

তাজ্জব।

—'কেয়া বাৎ কুণ্ডু বাবু, এ সরাবখানা, না শ্মশান ঘাট আছে ?'

—'আর বলো না খলিফাজী।' আফশোষে মুখ বিট্‌কেল হয়ে ওঠে কুণ্ডু বাবুর। বলে, 'কুলি কামিন শালারা আজ হপ্তা হরতাল করেছে। তাই কারুর টিকিটি নেই আজ।'

হাঁ ? খানে বিনা মরে এগুলো, আবার হপ্তা হরতালের রমজানি ? রাম রাম ! উল্লুক ন' নম্বর গলি।

—'শুধু তাই ? কাল পুরা হরতাল মানাবে আবার।'

আরে বাব্বা ! শালাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দিমাক ঠিক নেই। খালি ফালতু সোরগোল মচাতা।

'ছোড়ো ইয়ার। সরাব লাও।' ওসব বাজে ব্যাপারে খলিফা বাৎ করে না।

হঠাৎ চমকে উঠলো খলিফা মতিলাল। কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম জানাল সে—'সালাম বাবুলোক।'

চম্‌কে উঠেছে সে সরাবখানায় কয়েকজন বাবুলোককে দেখে। চেনে সে, মুখার্জিবাবু, বোস্‌বাবু, বাবুসাহেব রাম শর্মা, শঙ্কর সিং। এরা নিজেদের সমাজপতি বলে, মহল্লার বিচারক হ'তে চায়। মুদী কারবার ক'রে, মেয়েপট্টি চালায়। কারখানার সাহেবদের দোস্ত। এখানকার মজুরগুলির সঙ্গে, মতিলালকেও ওরা ঘৃণা করে। খলিফাকে চায় ওরা হটিয়ে দিতে। এরা এলাকার কারবারী মহলের কর্তা।

কিন্তু, হাঁ, তাজ্জব ! এরা কেন সরাবখানায় ? সঙ্গে আরও দু' চারজন ছিল। ভিন এলাকার ছোটখাটো ছিঁচকে গুণ্ডা। সরাব টানছে ওরা।

যা'নে দেও। লাও, সরাব চালাও। বেশী তাজ্জব হওয়া ভাল নয়। খলিফা তো সে।

মদ টানতে টানতে বিড় বিড় করে সে।—মরবে খাটিয়েগুলো জরুর মরবে। খানা নেই, পিনা নেই, হপ্তা হরতাল! আরে বাপ্‌রে! যত বাজে ফালতু কাজ। কুলি কামিন্‌ কা লড়াই।

কিন্তু খট্‌কা লাগছে বড়, দিমাক চটে যাচ্ছে বাবু শরীফ আদমি গুলোর সঙ্গে ছিঁচকে গুণ্ডাগুলোর গুন্‌ গুন্‌ ফুস্‌ ফুস্‌ কানাকানি ভাবভঙ্গী দেখে। কি চায় এরা, কি বলছে এরা? হাঁ, খলিফা ওদের সালাম ঠোকে, বাবু বলে মানে, কিন্তু লিখাপড়াবালা টোপিওয়ালা এসব আদমীদের সে বিশ্বাস করে না। বাবুলোক সব মতলববাজ আছে।

বেরিয়ে গেল সব বাবুলোকেরা। পিছে গুণ্ডা আদমীগুলো।

থুক্‌ ফেলল মতিলাল ছিঁচকে গুণ্ডাগুলোর দিকে চেয়ে। গুণ্ডা নয়, কুত্তা। বাবুদের পিছে পিছে ঘোরে। হাঁ, খাঁটি গুণ্ডাবাজীর দাম দিতে রাজী আছে খলিফা, রাজী আছে নিজের পাশে বসতে দিতে। কিন্তু এরকম নয়। ওদের মত হুকুম তামিল করনে-ওয়ালাদের নয়।

কুণ্ডুবাবু কেশো গলায় ভুঁড়ি কাঁপিয়ে নমস্কার ঠুকল বাবুদের দিকে চেয়ে। খলিফাকে বলল চোখ মেরে, 'হরতালের দাওয়াই দেবে শালাদের ভাল করে। মাল চেনেনি এখনও। দিনটাই আজ মাটি করে দিয়েছে।'

হরতালের দাওয়াই? সে আবার কি চীজ?

হটাও ফালতু কথা। সরাব খেতে খেতে নেশাটা জমে উঠেছে খলিফার।···

হঠাৎ একটা সোরগোলে তার নেশা যেন চড় খেয়ে কেটে গেল।

কেয়া বাৎ? মার দাঙ্গা? ন'নম্বর গল্লিমে? মতি খলিফার এলাকায়? শের খলিফা! এক ঝট্‌কা মেরে উঠে দাঁড়াল সে। হাঁ, খলিফা হ্যায় না মতি ন' নম্বর গলির? এ পরেশ না হয় লালু

হারামজাদার কাজ হবে জরুর। নয় তো, মাথা গরম, হরতাল সোরগোল মচানেওয়ালা রাজিন্দর, জগু, শিবুর ফালতু গোলমাল। শালাদের হাড্ডিগুলো গুঁড়িয়ে দিতে হবে আজ।

ছুটে এল সাকরেদদের নিয়ে।

রাম রাম। তাজ্জব মানল মতি ঘটনাস্থলে এসে।

ঝগড়া লাগিয়েছে বোসবাবু আর মুখার্জিবাবু, বাবু সাহ্'ব রাম শর্মা আর শংকর সিং-এর সংগে। আর ওদের পিছে পিছে ঘোরা গুণ্ডাগুলো হিন্দি বাংলায় ঝগড়া লাগিয়েছে নিজেদের মধ্যে।

কেয়া বাৎ? একই দলের লোক, দোস্ত আদমি সব, বঢ়ে বঢ়ে লিডর লোক সব নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল! মাতোয়ালে হয়ে গেল লোকগুলো?

—'আরে এ বাবু লোক, এ শালালোক, তুমলোক না অভি সরাব পি'তা রহা এক সাথ?'

—'হট্ যাও!' কে যেন ধমকে উঠল মতিলালকে।

রাগে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল খলিফার। শের খলিফা!

এঃ, ইমান ভুলে গেছে শালা বাবুসাহাব আদমিগুলো। বোসবাবু আর শংকর সিং, নাংগা ফকিরগুলোকে সাক্ষী মানছে, জঘন্য গালাগালির সমর্থন চাইছে, চাইছে প্রতিকার।

—'হট্ যাও, শালা দেখ্ লেংগে বাঙালী লোককো।' ছিঁচকে গুণ্ডাটার সংগে শংকর সিংও সায় দিল।

—'আয়রে শালা মেড়োর ডিম, ঢ্যামনার বাচ্চারা।' মুখার্জি-বাবুর তড়পানির ফাঁকে তার সাকরেদ হাঁকল।

হাঁ, ন' নম্বর গলি জেগেছে, কেটেছে ঝিমুনি, ভেঙেছে আড়মোড়া। ন' নম্বর গলির সবাই বাইরে এসেছে, ভাগ হয়ে গেছে দু'টো।

—'আরে কেয়া কর্ রহে তুম্‌লোক?' চীৎকার উঠল খলিফা—'ই লোক দোস্ত হ্যায়, মাতোয়ালে বন্ গিয়া হ্যায়।' দারুন গর্জনে ডুবে গেল শের খলিফার গলা।—'শালা লোক গালি কাঁহে দেতা?'

—'তোরা শালারা কেন গালি দিচ্ছিস্?' জবাব আসে।

রহমতের তন্দুরি রুটি বানাবার উঁচু উনুনটার উপর লাফিয়ে ওঠে রাজিন্দর।—'ভাই লোক!'...

'হাঁক দিল সে, এ দাংগামে ফাঁসো মৎ।'

হঠাৎ একটা ধস্তাধস্তির মধ্যে জান্তব গর্জন ওঠে। মার্... মার্।......

বেয়াকুফের মত খলিফা দেখল, বাবু সাহাবদের গুণ্ডাটার লাঠি সজোরে গিয়ে পড়ল রাজিন্দরের মাথায়।

তাজ্জব! বে-ইজ্জৎ শের খলিফার! কেউ মানল না। একই এলাকার দোস্ত আদ্‌মি বাঙালী হিন্দুস্থানী লড়াই স্বরু করে দিল। সারা ন' নম্বর গলি খুন খারাবীতে মেতে গেল।

থুক্! সব জান্‌বার হ্যায়, বিলকুল!

কিন্তু শের খলিফা হ্যায় না মতি?—খবরদা—র!

হাঁক দিল মতি।

খ্যাপা কুকুরের মত হাঁকল রাম শর্মাজী, 'ঠা'র যাও মতি।'

মতি ঠার যাবে? কেন, এ কার ইলাকা!—ঝাঁপ দিল সে ভিড়ের মাঝে, উজবুকদের ডাণ্ডাবাজীর মাঝখানে।—'খবরদা—র!'

ধাক্কা খেল খলিফা, ঝাঁ করে একটা ডাণ্ডা এসে পড়ল একটা চোখের উপর। ভিড়ের পেষণে ছিট্‌কে পড়ল সে মাটীতে! শের খলিফা!...

আর্ত্ত চীৎকার নারী পুরুষ শিশুর, কুকুরের আর গরুর। ক্রুদ্ধ গর্জন আর ডাণ্ডার ঠোকাঠুকিতে ন' নম্বর গলিকে আর চেনা যায় না।

—'শোন, শোন', রাজিন্দরের জায়গায় পরেশের বুড়ো বাপ অনেক কসরৎ করে উঠে হাঁকল।—'এ-লড়াই সয়তানদের'....

—'মার!'—জন্তুর চীৎকার ওঠে। নিষ্ঠুর শব্দ ওঠে আঘাতের।

তাজা গরম রক্ত খানিকটা ছিট্‌কে এসে লাগল খলিফার গালে।

—'এঃ।' থুক্ দেয় আবার মতি। একটা রক্তাক্ত চোখ হাত দিয়ে চেপে ধরে মাটি হিঁচড়ে হিঁচড়ে মার খাওয়া জানোয়ারের মত সরে যায় খলিফা! শের খলিফা!...

মাথাটা চৌচির হয়ে লুটিয়ে পড়েছে' পরেশের বাপটা। খাবি খেতে খেতে ও বিড়্ বিড়্ করছে : 'ভেঙে দিল হরতালটা, শালারা ভেঙে দিল।'...

উল্লুক কাঁহিকে! জিভ্ দিয়ে গালের বেয়ে পড়া রক্তের দলা চেটে নিল খলিফা।...হরতাল ভেঙে যাবে? শালা, এ মাতোয়ালের লড়াই না? হরতাল ক্যায়া হোগা? ফালতু গোল মচাতা। বে-ইমান ন' নম্বর গলি। জানবারের ইলাকা।

গোঁ গোঁ করে ছুটে এল দুটো পুলিশ বোঝাই লোহার জালে ঘেরা গাড়ী।

কেয়া বাৎ? ধুলো আর রক্তে মাথা চোখের পাতা খুলতে চেষ্টা করল সে।- মতি খলিফাকে পাকড়াতে কয়েকবার এসেছে পুলিশ লরী ন' নম্বর গলিতে। কিন্তু কি গোস্তাকি করেছে আজ খলিফা?

কিন্তু পুলিশ ভ্রূক্ষেপও করল না খলিফাকে। তারা এন্তার ঠেঙ্গাতে লাগল কুলি কামিনগুলোকে আর ঠেলে ঠেলে তুলতে লাগল লোহার জালে ঘেরা গাড়ীর মধ্যে।

সব সাফ হয়ে গেল ন' নম্বর গলি। খালি পড়ে রইল বুঢ্ঢা বাচ্চা জেনানা ডরপুক আর জখমী আদমিগুলো। আর যত জঙ্গী যোয়ানগুলোকে গাড়ী ভরে নিয়ে গেল পুলিশ। এ গলির সবচেয়ে ভাল মানুষ যোয়ানদের। যারা লড়িয়ে, বিদ্রোহী।

মাতোয়ালেগুলো সব বে-পাত্তা, সেই সঙ্গে বাবুসাহাব আর ছিঁচকে গুণ্ডাগুলোও।

বড়ি তাজ্জব কি বাৎ! সারা ন' নম্বর গলিকে গলি পুলিশ পাক্‌ড়ে নিয়ে গেল?

একটা ময়লার গাড়ীর চাকায় মাথা রেখে—জিভ দিয়ে গালের ধুলো রক্ত চেটে নিল সে। উজবক হয়ে গেছে শের খলিফা। মার খাওয়া জানোয়ারের' মত কানা, চোখটা তুলে ধরল সে। বিড় বিড় করতে লাগল মাথা ঝাঁকিয়ে, 'ক্যায়া, আজ সারা ন' নম্বর গলিকে গলি খলিফা বনে গেল?'

সমাপ্ত